Sri Kumud Nath Dutta
14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE
TALA. CALCUTTA-2.

কল্পান্ত

বৈদ্যনাথ ঘোষ

সংস্কৃতি সংসদকে
(টালা)
শ্রী বৈদ্যনাথ ঘোষ
কর্তৃক উপহার প্রদত্ত
তারিখ— ১৫/৪/৬৪

সংস্কৃতি সংসদ
টালা
পাঠাগার ও কার্য্যালয়
১৪সি, কালী কুমার
ব্যানার্জি লেন,
কলিকাতা—২
তারিখ— ১৫/৪/৬৪
সংখ্যা—

অগ্রণী বুক ক্লাব

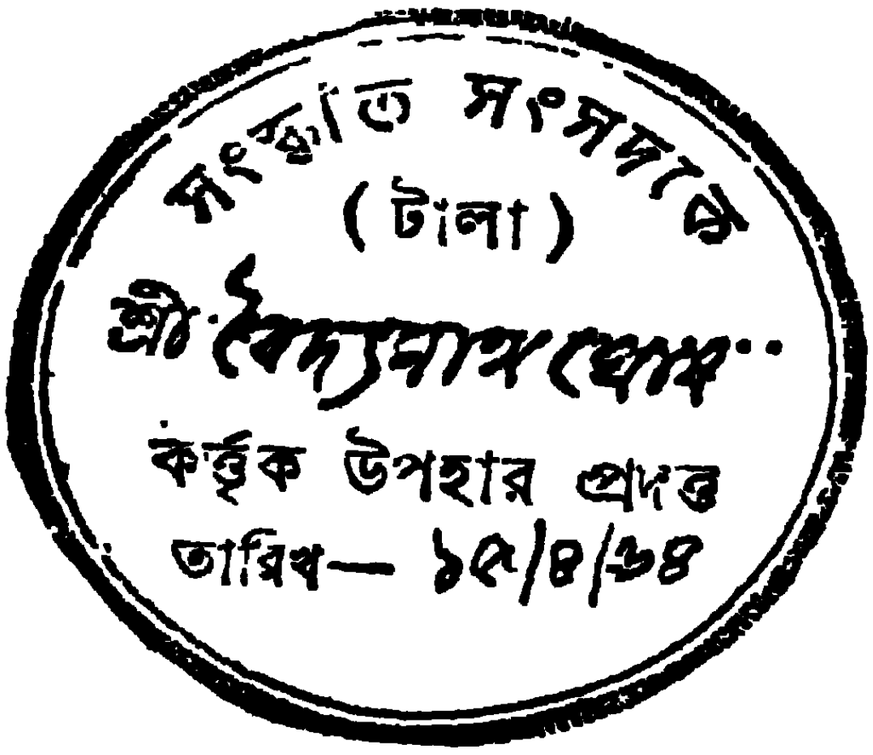

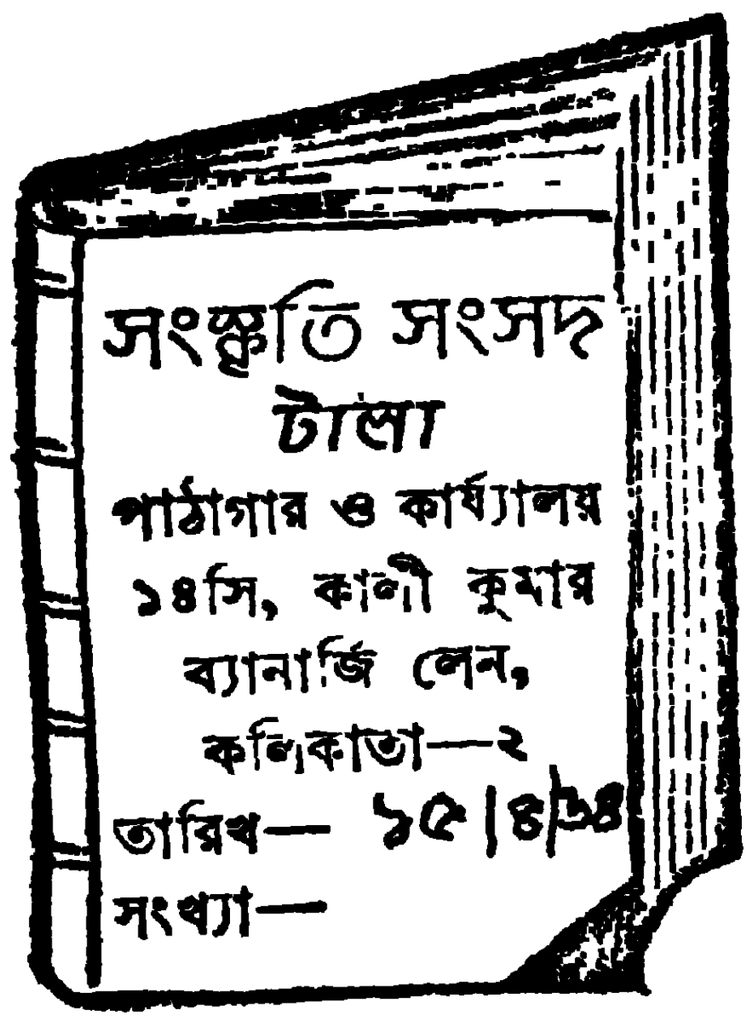

প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী প্রেস
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

৮৩০.১
বৈদ্য।কা

প্রচ্ছদপট
বিশ্বনাথ দাস

Jaikrishna Public Library
Acc. No. ২৩৩১৮ Date

ব্লক ও কভার
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
২ অক্টোবর, ১৯৪৯
পাঁচ টাকা

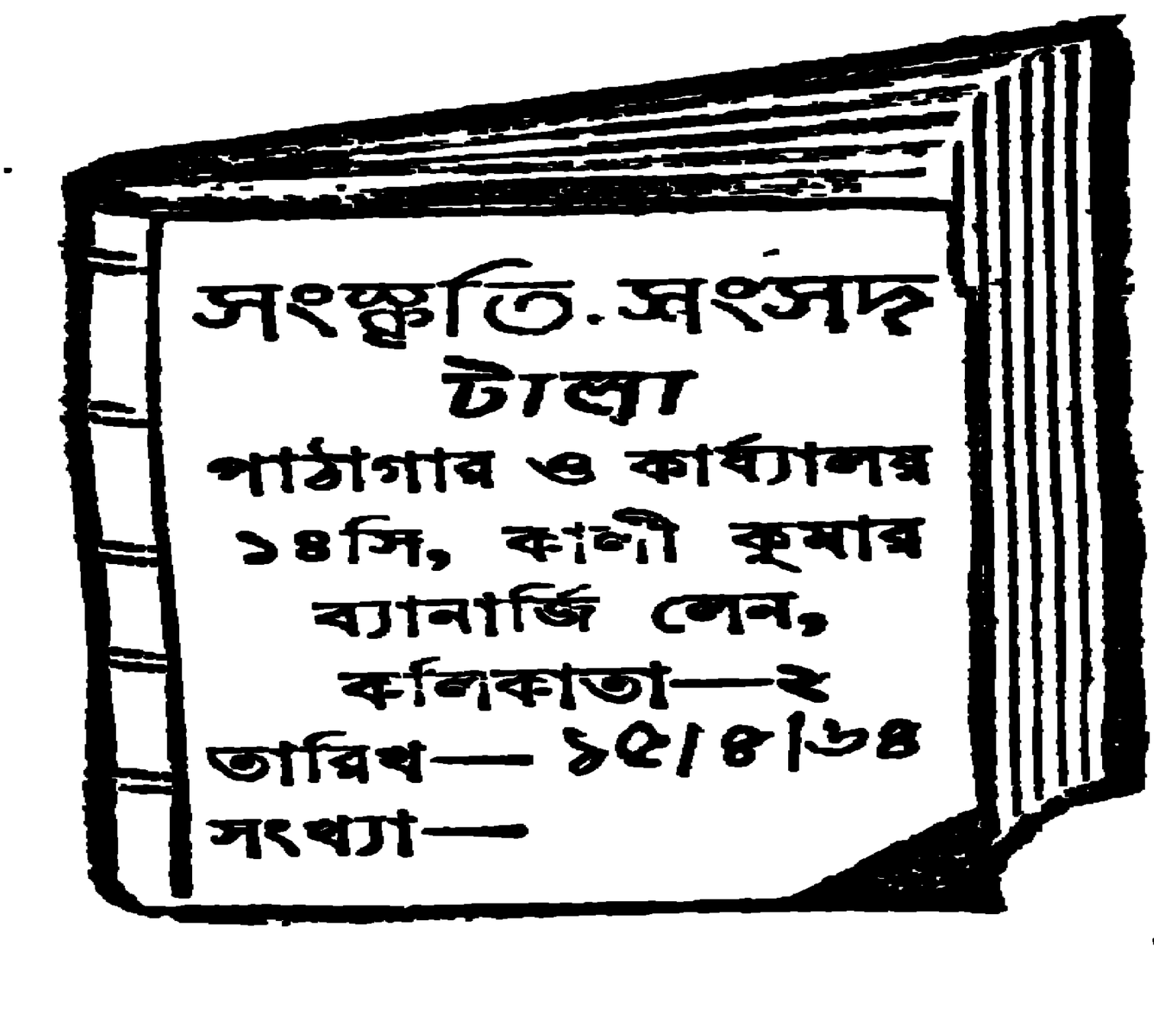
সংস্কৃতি-সংসদ
টালা
পাঠাগার ও কার্য্যালয়
১৪সি, কালী কুমার
ব্যানার্জি লেন,
কলিকাতা—২
তারিখ— ১৫।৪।৬৪
সংখ্যা—

প্রথম সর্গ

কুঠরীতে পরিবর্তিত। দ্বিতলের বারান্দার রেলিংগুলো বিবর্ণ জীর্ণ, নূতন জোড়াতালির অসঙ্গতিতে পূর্ণ।

পূর্বদিকে বাড়ির মালিকদের বাসস্থান, বাকী তিন দিকে উপরে ও নিচে নানা পরিবারের বাস, অর্থের পরিবর্তে সাময়িক অধিকার। অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত, কেউ কেউ মধ্যবিত্ত ঘেঁষা।

মালিকরা চার সরিক। উপরে নিচে মিলে খানদশেক ঘর• রান্নাঘর নিয়ে একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা। অবশ্য বাসিন্দাদের সগোত্র হতে এখনো এদের আপত্তি প্রকাশ পায় দরজা জানালায় পর্দার বহরে।

পর্দার অন্তরালে হয়তো মুমূর্ষু আভিজাত্যের নরণ কাতরানি ঢাকা পড়ে।

চার সরিকের মধ্যে দু সরিক, মেজ এবং সেজ বিদেশে থাকেন। মেজ শিবকালী মিত্র মেদিনীপুরে জামাতা হিসাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করেন; অবস্থা বর্তমান কষ্টিপাথরে ধনী না হলেও উচ্চমধ্যবিত্ত বলা চলে। সেজ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, পুরুষানুক্রমিক ছন্দ ভেঙে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করার চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান,—কখনো বোম্বাই, কখনো দিল্লী, কখনো ক'লকাতা। পুরাতন ছন্দের প্রতি অনুরাগ না থাকলেও যুগছন্দের মর্ম তিনি ভালই বোঝেন।

এ বাড়িতে বাস করেন বড় ও ছোট। বড়কর্তা রামকালী মিত্র : সাবেকী মানসিকতার ছিটেফোঁটা তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। এখনো তাঁর চরিত্রে একটু অহংকার মিশ্রিত উদারতা, একটু খোসামোদ-প্রিয়তা, একটু ভোজন-বিলাস এবং সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষণীয়। ছোটকর্তা ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র : মানসিক গঠনে শুধু সাবেকী অহংকারের অধিকারী,—তবে সে অহংকারের বহি-প্রকাশ অতিবিনয়ের আবরণে নব রূপে রূপায়িত। তিনি অসাধারণ

কৃপণ ; পাছে অহংকারের তাগিদে খরচার দায়ে পড়েন সেই চেতনা তাঁকে বিনয়ীর নামাবলীধারণে বাধ্য করেছে।

দোতলায় কর্তাদের পশ্চিম দিকে, উপর-নিচে চারখানি ঘর নিয়ে থাকেন হারাধন রায়, তাঁর স্ত্রী ও দুটি সন্তান। বয়েস বছর চল্লিশ হবে, কোনো সওদাগরী অফিসে কাজ করেন।

• তার পাশে নিচে দুখানি ঘর নিয়ে থাকেন নিবারণ জানা ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরা নিঃসন্তান। পেশা শেয়ার মার্কেটের দালালী। কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন রঙীন চোখে, যেদিন দু' পয়সা হাতে থাকে স্ত্রীকে আদর করেন, যেদিন থাকে না করেন প্রহার।

কলতলাঘেঁষে চারখানি ঘর নিয়ে থাকেন আরেকটি পরিবার : বিধবা মাতা, তাঁর তিনটি পুত্র, একটি বধূ। ছোটটি পড়ে কলেজে, নাম মনোহর দত্ত। বাকী দুজন চাকরী করে, একজন বেংগল কেমিকেল, একজন কাগজের অফিসে। এ সংসারে স্বচ্ছলতার চেয়ে শান্তিই বেশি চোখে পড়ে।

সদর দরজার পুর্বদিকে তিনখানি ঘর নিয়ে থাকেন ব্রজহরি চট্টোপাধ্যায়, তাঁর রুগ্না স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্যা। পেশা পাটের দালালী।

সদর দরজার পশ্চিম দিকে এক একটি ঘর নিয়ে থাকেন এক একটি লোক। একজনের নাম সুরেন সিংহ, কারখানার ফিটার। একজন নিমাইচন্দ্র চন্দ, ঘড়ি সারায়। একজন সুজিত ঘোষ, পেশা অজানা। এরই ওপরতলায় থাকেন সুজাতা সেন, কোনো ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

এ ছাড়া বাড়ির পেছন দিকে সাবেককালের গোয়ালঘরগুলো ভাড়া করে থাকে একদল বিহারী গাড়োয়ান। ওদিকটা পড়ে যাচ্ছিল দেখে কর্তারা ওদের সামান্য ভাড়ায় বিলি করে দিয়েছেন।

প্রচণ্ড জয়োল্লাস করে উঠলো বিজয়ী দল।

নেতার দিকে চোখ পড়তেই ক্লান্ত মুখগুলো ভয়ে শুকিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাদের চেঁচামেচিতে আরো গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে এসে জুটলো ব্যারিকেডের ধারে। তাদের মুখেও আশংকার ঘন কালিমা ফুটে উঠেছে। একটি ছোট মেয়ে তার ফ্রকের ফিতেটা খুলে নেতার হাতে দিয়ে বললে, মিনটুদা এটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেঁধে নাও। রক্ত যে বড্ড পড়ে গেল!

নেতা তথা মিনটুর তখন সেদিকে খেয়াল নেই। সে ভাবছে বাড়িতে কি কৈফিয়ত দেবে, সেই কথাই। তাকে ফিতেটা না নিতে দেখে মেয়েটি নিজেই ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেবার জন্য এগিয়ে গেল। একটি ছেলে তার হাত থেকে ফিতেটা নিয়ে বললে, দে, দে, তুই বাঁধতে পারবি না, আমায় দে?

ফিতেটা কপালে জড়াতে জড়াতে ছেলেটি বললে, কি করে বাড়ি যাবি মিনটু? কাকা কিন্তু ভয়ানক মারবে।

কথাটা শুনে মিনটু একবার অসহায় দৃষ্টিতে চারদিক তাকালো। তারপর মিনতিভরা গলায় মেয়েটিকে বললে, রুনু, লুকিয়ে দেখে আসবি, বাবা কোথায়?

তার কথায় মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে বললে, এখন রুনু দেখে আসবি! কেন? বীর পুরুষ মারামারি করার সময় মনে থাকে না? যাও আমি পারবো না।—একটা মুখভঙ্গী করে রুনু চলে গেল।

তার গতির দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল মিনটু। সে অন্য একটি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললে, আমার ত এখন বাড়ি যেতে হবেভাই. মাথাটা বড় ব্যথা করছে। কিন্তু.....

তার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অমি বললে, সে আমি রইলুম। তোর ভয় নেই। ওরা আর আসছে না এদিকে।

দেখে নেব শুয়োরদের। ওরা আসুক না এবার।—কতকগুলো

মিনটু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ; ললিত হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, ঠিক বলেছিস, ভীতুগুলো ভয়েই পালিয়ে যাবে। আজই সবাইকে হুইসিল কিনতে বলে দেব। কি মজাটাই হবে।

ঘরে এসে ঢুকলেন মৃণ্ময়ী দেবী, তাঁকে দেখে ছেলেরদল আবার জড়সড় হয়ে বসলো। ছদ্মগাম্ভীর্যে বললেন তিনি, এই বুঝি চুপ করে বসে থাকা তোদের ?

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে রইলো সবাই। ঘরে এসে ঢুকলেন হারাধনবাবু : বলিষ্ঠ শরীর, পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী, রং এককালে ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে এসেছে ; পরিশ্রমের ক্লান্তিতে দেহটা একটু নুয়ে পড়েছে ; নাক-চোখ ধারালো, মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় যোদ্ধা। হাতের ফাইলটা টেবিলে রেখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, মিনটু আছে কেমন ?

ভালই।

ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন। এই যে, বগীর দলও যে হাজির।

তোরা এবার বাড়ি যা, আবার কাল আসবি। বললেন মৃণ্ময়ীদেবী। তারা মিনটুর দিকে একবার চেয়ে উঠে বেরিয়ে গেল।

মিনটুর গায়ে একটা চাদর চাপা দিয়ে বললেন মৃণ্ময়ীদেবী, শুয়ে থাক্ চুপ করে, আমি আসছি।

মিনটু অনিচ্ছায় চোখ বুজলো।

॥ ৪ ॥

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানা : গ্রীষ্মের দিনে দিবানিদ্রার পক্ষে যে ঘরটা বড়কর্তা রামকালী মিত্রের অতি প্রিয় এবং তাঁর পুত্র অমিয়কান্তি ওরফে অমি, ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সুমিত্রা ওরফে রুনুর অতি অপ্রিয় ; দুই পাশে দুইজন দিবানিদ্রাবিরোধীকে নিয়ে সেখানে রামকালীবাবু শায়িত ; বয়স পশ্চিমে হেলেছে ; চেহারার মধ্যে রাগ কেদারার গাম্ভীর্য ; পোক্তা বাঁধনে লম্বা চেহারা, সুকান্তি বললে আপত্তি হবে না। কণ্ঠস্বরে তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য,—খাদপঞ্চমে বাঁধা গুরুগম্ভীর নাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ; কথা বলার সময় শেষের দিকটা গভীর গমকে অর্দ্ধ-সমাপ্ত বলে মনে হয়। ছেলেরা তাঁর চেয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ভয় করে বেশি।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে দুধারে দুজনের গায়ে হাত চাপিয়ে তিনি বললেন, কি রে তোরা ঘুমোলি ?

এতক্ষণ যদিও দুজনেরই চোখ কড়িকাঠ গণনায় ব্যস্ত ছিলো, রামকালীবাবুর প্রশ্নের পরেই তা নিদ্রায় মুদিত আছে বলে মনে না হওয়ার কোন কারণ রইল না। তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় কাটিয়ে দুজনের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

বন্ধ দরজার গোড়ায় টিক্‌টিকির আওয়াজের অনুকরণে টাক্‌রার শব্দ হতেই অমি চঞ্চল হয়ে পড়লো ; সে চারিদিক ভাল করে দেখে বিড়ালের মত নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। জানা না থাকলে ভেবে নেওয়া খুবই সোজা যে মেজেতে রবারের ম্যাটিং করা ! অমির পর রুনুও এই একই দক্ষতার পরিচয় দিলে।

অমি চাপা গলায় রুনুকে বল্‌লে, তুইও বেরিয়ে এলি কেন ?

বলে উঠলো, অমি, আজ কুলের যাত্রা ভাল রে। মাঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে।

অমি বললে দুহাতে তালি বাজিয়ে, জয় মা কালী, চল্ ওই পাটের নৌকোটায় বাঁধা ছোট ডিঙ্গিটা নিয়ে স'রে পড়ি। কথার শেষের তারা দুজনে খালের পাড় বেয়ে নামতে শুরু করে দিলে। ধারের পাটাতনের ওপর দিয়ে বড় পাটের নৌকোটায় উঠে তারা উঁকি মেরে দেখে নিলে ভেতরটা, তারপর বাঁদরের মত ঝুলে পড়লো ছোট ডিঙ্গিটার ওপর। অতি সন্তর্পণে দড়ি খুলে, বাঁশের লগিটায় একটা ঠেলা দিয়ে মিনটু বললে, মাঝিগুলো খুব ঘুমোচ্ছে, আজ অনেকটা ঘুরে আসা যাবে!

অমি বললে উৎসাহিত কণ্ঠে, আজ গঙ্গার দিকে চল্, পোলের গোড়া থেকেই ফিরে আসবো। পকেট থেকে আমের আচার বার করে দু-টুকরো নিজের মুখে পুরে দু-টুকরো মিনটুর মুখে ঢুকিয়ে দিলে। মুখের মধ্যে আমের আচার পেয়ে মিনটু ফুর্তিতে জোর জোর লগির ঠেলা দিতে লাগলো। তর তর করে তাদের ছোট ডিঙ্গিটা ভেসে চললো খালের মুখের দিকে।

অমি বললে, জানিস মিনটু বিজয় সিংহের গল্প? বাবা বলেন, তিনি নাকি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে লঙ্কায় রাবণের দেশে চলে গেছলেন! তখন তো ষ্টীমার ছিলো না নৌকায় করে তাঁকে যেতে হয়েছিলো!

আগের টকে মুখটা বিকৃত করে বললে মিনটু, তা আবার জানি না! বিজয়সিংহ বাঙালী ছিলেন, লঙ্কা জয় করে নাম রেখেছিলেন সিংহল।

অমি মাথা নেড়ে জানালে সেও একথা জানে।

আর একজন কে ছিলেন বল তো পৃথিবী ঘুরেছিলো? প্রশ্ন করলো অমি মিনটুকে ঠকাবার জন্য।

মিনটু চিন্তিত হয়ে পড়লো ; বললে অস্পষ্ট গলায়, ম্যাগ্ ম্যাগ্ ম্যাগেলন। অমি হেরে গিয়ে চুপ করলো। ম্যাগেল্যানের গল্প ভাবতে ভাবতে মিনটুর খেয়াল নেই, হাতের লগিটা গেল গভীর জলে তলিয়ে, মাটিতে ঠেকলো না ; পরমুহূর্তেই ছোট ডিঙিটা একটা প্রচণ্ড ঘুরপাক খেয়ে গিয়ে পড়লো গঙ্গার স্রোতে। মিনটু প্রাণপণে হাতের থেকে ভেসে-যাওয়া লগিটা ধরবার চেষ্টা করলে। লগিটা তার নাগালের মধ্যে আসার বদলে, ডিঙ্গিটা হুড়মুড় করে এগিয়ে যেতে লাগলো গঙ্গার ভেতর দিকে !

চারিদিকে অথই জলস্রোত ! মিনটুর মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠলো ; সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে ! নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অমির দিকে চাইলে ; অমি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে।

সে বললে, ভয় কি অমি ! ওই দেখ সামনের ওই জেটিটায় ডিঙ্গিটা ঠিক গিয়ে ধাক্কা খাবে সেই সময় আমি লোহার শেকলটা ধরে ফেলবো, তুই আমাকে ছাড়িস্ নি, জড়িয়ে ধরে থাক।

তার কথায় অমি যেন একটু সাহস পেলো। সে জড়িয়ে ধরলে তাকে। ডিঙ্গিটা তখন হুহু করে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। জেটির পাশে ডিঙ্গিটা পৌঁছতেই, মিনটু অমিকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আমায় ধরে থাকিস্ জোরে। সে লাফিয়ে একটা শেকল আঁকড়ে ধরলে, সঙ্গে সঙ্গে অমিও ঝাঁপিয়ে পড়লো শেকলটার ওপর। দুজনের চললো স্রোতের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। কাত হয়ে যাওয়া ডিঙ্গিটা একটা হেঁচকা টানে ভেসে চলে গেলো। দুটি বালকের স্রোতের সঙ্গে লড়াইয়ে পাগুলো টান হয়ে ভেসে উঠেছে, চোখে মুখে লাগছে ঢেউয়ের ঝাপটা,—মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে জেটির তলার দিকে। দাঁতে দাঁত টিপে মিনটু বললে চেঁচিয়ে, শেকলটা কিছুতেই ছাড়িসনি অমি, ছাড়লেই জেটির তলায় টেনে নিয়ে যাবে !

বুজে ধুমপান করা রামকালীবাবুর কাছে আজও আদর্শ বিলাসিতা ; ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বাস্তব দুনিয়াটা বুঝি আড়াল পড়ে।

ঘরে প্রবেশ করলেন ছোট কর্তা ব্রজেন্দ্রনাথ : দুজনের মধ্যে চেহারার পার্থক্য প্রচুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীর্ণ, পারাবত বক্ষ, শুষ্ক পেশীর প্রাচুর্যে হতশ্রী ; কোটরাগত চক্ষুর মধ্যস্থলে দোদুল্যমান তিলক শোভিত নাসিকা, ক্ষীণ ওষ্ঠে অদ্ভুত একটি বিনয়ী হাসি,—মাথায় টিকি, গলায় কণ্ঠি, পরনে আধময়লা আট হাতি।

তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে রামকালীবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন। গলা খাকরানি দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, দাদা একটা কথা—

বলো।

বলছিলুম রুনুর বিয়ের কথা.....একটু ইতঃস্তত করে বললেন তিনি।

রামকালীবাবু সোজা হয়ে বসে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, মানে!

ব্রজেন্দ্রনাথের ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল—তিনি বিনয়ী গলায় বললেন, মানে—রুনুর বয়স তো কম হলো না, বার তের প্রায় হতে চলেছে। খুব বেশি বয়সে বিয়ে আমার পছন্দ নয়! রামকালীবাবুর কাছে ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্র অজ্ঞাত নয় ; তিনি ভাল করেই জানেন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা, তবু তিনি বললেন বিস্মিত কণ্ঠে, তুমি কি দিনে দিনে পাগল হতে চলেছ ব্রজেন? এতটুকু কচি মেয়ের বিয়ে দেবে!

কোন রকম চাঞ্চল্য না দেখিয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ—কেন রীতি হিসাবে এটা কি মন্দ? তা ছাড়া বার তের বছরের মেয়ে, এমন কিছু আর কচি নয়, বাল্যবিবাহ একে বলা চলে না!

মন্দ নয়! কি বলছো তুমি ব্রজেন! তাঁর গলার স্বর নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

ললিত বললে, বাছাবাছি কি ? বউয়েরা বরের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। রুনু গিযে মিনটুর কাছে দাঁড়ালো, সকলের মধ্যে একটা অর্থপুর্ণ আঁখি বিনিময় হয়ে গেলো ; রেবা গিয়ে দাঁড়ালো অমির কাছে, আর লীলা ললিতের কাছে ; ভুতো একা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ; খেলতে পাবেনা ভেবে তার কান্না পেয়ে যাচ্ছে !

অমি বললে তার দিকে চেয়ে, এই ভুতো, তুই আমাদের চাকর হবি ভাবনা কি ?

আশ্বস্ত হয়ে ভুতো নিশ্বাস ছাড়লো, সেও তাহলে খেলতে পাবে।

খেলা শুরু হলো : কিশোর মনের নানা বিচিত্র খেয়াল ; কেউ নকল সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ; কেউ নকল আপিসে যাওয়া নিয়ে ; কারুর স্ত্রীর ওপর কর্তামি, কারুর স্বামীকে সন্তুষ্ট করার অদ্ভুত চেষ্টা ! ইটের পার্টিশন দেওয়া প্রত্যেক পরিবারের এক একটি পৃথক ঘর, তারই মধ্যে তাদের নকল সংসারযাত্রা ! কতক্ষণ খেলা চলেছে খেয়াল নেই। রামকালীবাবুর কণ্ঠস্বরে তাদের চৈতন্য হতে খেলা ছেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

রুনু মা ! রামকালীবাবু এসে দাঁড়ালেন সিড়ির দরজায়। একলাফে রুনু গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললে, কি জ্যেঠুবাবু ?

কিছু না ! বলে জড়িযে ধরলেন তাকে রামকালীবাবু।

রুনু তাঁর গায়ে মাথাটা চেপে ধরে বললে, তুমি কাঁপছ কেন জ্যেঠুবাবু, তোমার শরীর খারাপ নাকি ?

হ্যাঁ মা, শরীবটা আজ ভাল নেই। একটা উদ্‌গত নিঃশ্বাস চেপে নিলেন তিনি। রুনু বললে তাঁর হাত ধরে, চলো জ্যেঠুবাবু শোবে চলো, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিগে। মাতৃভক্ত সন্তানের মত রামকালীবাবু রুনুর পেছনে পেছনে নিচে নেমে গেলেন। ছেলেদের খেলাও আর জম্‌লো না, তারা বাড়ি ফিরলো।

আকাশে রংএর খেলাও শেষ হয়ে আসছে।

দারোগা পকেট থেকে বাঁশী বার করে দ্বিতীয়বার বাজালেন। মিনটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, একটু আগে কি তুমি বাঁশী বাজিয়েছিলে ?

হুঁ ! কেন ?

ওঃ, কিছু না। বলে মিনটু একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সাম্‌নে চাইল।

খোকা প্যাণ্টটা খোল তো।

অন্যমনস্ক হয়ে সে বললে, কেন ?

খোলই না, লজ্জা কি ? প্যাণ্টের বোতামে হাত দিয়ে বললেন দারোগা।

একটা ঝট্‌কা টান মেরে সে দারোগার হাত ছাড়িয়ে নিতাইয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

নিতাই পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, দারোগাবাবু দেখতে চান তোমার প্যাণ্টের তলায় কিছু আছে কি না !

অভিমান ভরে বললে, ও, আমি চোর ?

না না অমনি দেখতে চাইছেন ! নিতাই তাকে ভুলিয়ে প্যাণ্টটা খুলে ঝাড়া দিয়ে দেখিয়ে দিলে দারোগাকে। ওর চোখ থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে !

দারোগা তাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লেন, কি হয়েছে খোকা কাঁদছো কেন, যাও বাড়ি যাও ছুটি !

সে দারোগার হাতটা তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওরা এগিয়ে গেল সুজিৎ ঘোষের ঘরের দিকে। তারপর কড়া নেড়ে ডাকলে, সুজিৎবাবু ! সুজিৎবাবু !

চোর দেখার লোভে সেও পেছন পেছন দিয়ে দাঁড়ালো।

সুজিৎবাবুর দরজা খুলে গেলো ; পুলিশ দেখে চোখ দুটো ধ্বক্‌

করে জ্বলে উঠলো, সাম্‌লে নিয়ে বললেন স্বাভাবিক কণ্ঠে, এই যে আপনারা, সুপ্রভাত !

এই লোকটা চোর ! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করতে লাগলো মিনটু ।

দারোগা ঘরে ঢুকে একটা কাগজ দেখিয়ে বললেন, আপনার নামে একটা ওয়ারেণ্ট আছে । সেই সঙ্গে আপনার ঘরটাও একবার দেখতে হবে !

সুজিৎবাবু বললেন নির্লিপ্তভাবে, দেখুন ! তারপর একটা কাঠের চেয়ারে জানালার দিকে মুখ করে বসে পড়লেন ।

মিনটু লক্ষ্য করতে লাগলো, শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যেও তার কপালের শিরাগুলো এক একবার ফুলে ফুলে মিলিয়ে যাচ্ছে ।

সারা ঘর ওলটপালট করে খানাতল্লাসী চললো ; মেজের ওপর রাশিকৃত বই জমা হলো, বিছানা বালিশের তুলো ছিঁড়ে জম্‌লো তুলোর পাহাড় খাটের ওপর । ছবির ফ্রেম খুলে ছবি গিয়ে পড়লো মেজেতে, জলের কুঁজোর পেছন দেখতে গিয়ে জলের কুঁজোটা গেল উল্‌টে ।

ঘণ্টাখানেক ধরে নানারকম সন্ধানকার্য চললো ; মিত্তির বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা সবাই প্রায় নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে, তাদের মুখে বিচিত্র ভয়মিশ্রিত কৌতূহল !

খানাতল্লাসী শেষ করে হতাশভাবে বললেন দারোগা, না, আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেলো না ! চলুন সুজিতবাবু এইবারে আপনাকে যেতে হবে !

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত সুজিৎবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে একটুকরো ক্ষীণ হাসি ।

নিতাই ভয়ে ভয়ে বললে, আমায় কি করতে হবে হুজুর ?

দারোগা একটা লম্বা হল্‌দে কাগজ তার হাতে দিয়ে বললেন, সই করুন ? ঠিক সেই সময় একজন পুলিশ একখানা ছেঁড়া বই

সামনে একটা ইতিহাসের বই খোলা ; মিনটু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মৃণ্ময়ীদেবী ছোট খুকীর জন্যে ফ্রক্ সেলাই করছেন বসে ; হঠাৎ তাঁর চোখ মিনটুর ওপর পড়তেই বললেন, এই বুঝি তোর পড়া হচ্ছে ?

মিনটু চম্‌কে খোলা পাতার দিকে চেয়ে পড়তে আরম্ভ করলো, সিপাই বিদ্রোহের পর মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারত শাসনের ভার লইলেন, তাঁহার সুশাসনে লোকে সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল...সেই সময় হই...তে...ই।

মিনটুর পড়া বন্ধ হয়ে গেলো সে ছটফট করে উঠে পড়লো।

কিরে উঠে পড়লি যে ? বললেন মৃণ্ময়ীদেবী।

এই যে আসছি! বলে মিনটু বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো।

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে—কোন লোকজন নেই! সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো,—মাষ্টারনী বললেন আমাদের জন্যে উনি জেলে গেলেন! কিন্তু কই ? সকলেই অন্য দিনের মত যে যার কাজে ব্যস্ত! ওই তো রামকালীবাবু গড়গড়া টানছেন ; ফিটফাট মনোহরবাবু টেরি বাগাচ্ছেন : নিবারণ জানা কি নিয়ে যেন বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছেন ; সুজিৎবাবুকে যে ধরে নিয়ে গেলো সে সম্বন্ধে তো কারুরি খেয়াল নেই! তবে কি মাষ্টারনী মিথ্যে বললেন ?...সে চাইল সুজিৎবাবুর ঘরের দিকে। দেখলে অমির কাকা ব্রজেন্দ্রবাবু, আর ললিতের বাবা ব্রজবিহারী কি যেন বলাবলি করছে দাঁড়িয়ে। সে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলে। ব্রজেন্দ্রনাথের গলা ক্রমেই সপ্তমে উঠেছে—তার কানে এলো—কোথাকার বাউণ্ডুলে ছোকরা এসে জুটলো আমাদের বাড়িতে, তাও যাবি যা ঘরের চাবিটা খুলে রেখে গেলেই তো হতো, এখন দেখোত গেরো! তালা বন্ধ পড়ে থাকবে ভাড়াও পাওয়া যাবে না। ওর মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল

কেন ভক্তিমার্গের ওপর এত অশ্রদ্ধা কেন তোমার ? বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে।

অশ্রদ্ধা নয় হে ! আমি দেখছি, যতই তুমি কৃষ্ণপ্রেমে মজছো ততই তোমার সাংসারিক প্রেম কর্পুর হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া কাপড় কোপনীতে দাঁড়াচ্ছে আর কামিনী না হক, কাঞ্চনপ্রীতিতে প্রসিদ্ধ হচ্ছো !

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কি করবো দাদা, সামান্য আয়, তাতেই সংসার চালাতে হয়, তোমার কি বল ? অভাব তো নেই !

হেসে শিবকালীবাবু বললেন, আহা বিনয়ের অবতার ! এই একটা গুণ অবশ্য পেয়েছ বৈষ্ণবী আখড়ায়।

দেখ মেজদা, ভগবত প্রেম নিয়ে ঠাট্টা করা ভাল নয় !

তোমরা যে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের কথা ভুলে যাও তাতেই তো গোল বাধে !

ভুল্‌বো কেন ? তবে গোপালই আমাদের আরাধ্য !

যাই বলো ওই নেড়ানেড়ী কিন্তু দেশকে ডোবালে।

ভুল কথা, যদি আমাদের কেউ রক্ষা করে থাকে তবে সে ওই বৈষ্ণব-ধর্ম, নয়তো বর্ণাশ্রমের জুলুমে কোনদিন সবাই মোছলমান হয়ে যেত ! নিতাইয়ের প্রেমেই তবে গেলো বাংলাদেশ !

শিবকালীবাবু রামকালীবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, দেখছো দাদা শাক্তকুলের প্রহ্লাদ।

আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার মানসে বললেন রামকালীবাবু, রুনুর বিয়ের কি হবে তাই বল !

এ বিয়ে হতেই পারে না। গম্ভীরভাবে বললেন শিবকালীবাবু। থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কেন কেন ?

যদিও ভ্রাতাদের মধ্যে কোন আর্থিক অধীনতা নেই তবু, বড়লোক

মেজকর্তাকে অসন্তুষ্ট করা ব্রজেন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত। মেজকর্তার সোজা আপত্তি শুনে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন।

আবার আরম্ভ করলেন শিবকালীবাবু, ব্রজ। দিনে দিনে সত্যিই তুমি অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছ! এইটুকু মেয়ে, তাতে আবার ভাল বর, ঘর নয়। একটা তো মেয়ে, দেখে শুনে পরে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দি'ও।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন ব্রজেন্দ্রনাথ, একবার বড়কর্তা একবার মেজকর্তার দিকে; কথাটা যেন তাঁরও মেনে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ভাল পাত্রের জন্যে ভাল টাকারও প্রয়োজন, মনে পড়তে তিনি চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন, সবই প্রভুর ইচ্ছা মেজদা, এতে মানুষের হাত কতটুকু! রুনুমার কপালে যদি দুঃখ থাকে, কে খণ্ডাবে বলো?

এমনসময় ঘরে এসে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ: বড় ভাইদের তুলনায় চেহারায় লালিত্যের অভাব থাক্‌লেও সেটা খুব চোখে পড়ে না; জার্মেনী কায়দায় চুল ছাঁটা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো, চক্‌চকে দর্শনধারী: সাদা ট্রাউজারের ওপর ডেসিং গাউন চাপানো, মুখে আধহাতখানেক চুরুট।

তিনি এসে তক্তপোশের এককোণে পা ঝুলিয়ে বসে বললেন রামকালীবাবুকে লক্ষ্য করে, দেখ দাদা চেয়ার দু-চারখানা এনে রাখো, নয়তো বড় অসুবিধা হয়।

একটু লজ্জিত হয়ে বললেন রামকালীবাবু, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ভুল হয়ে গেছে, আজই আনিয়ে নিচ্ছি।

হেসে বললেন শিবকালীবাবু, তুমি যে দিনে দিনে সায়েব বনে যাচ্ছ তা দাদা জানবে কি করে; তোমার অগ্রগতিটা খেয়াল রেখো!

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন চুরুটে একটা টান দিয়ে, তার চেয়ে বলো তোমরা যে পেছিয়ে যাচ্ছ সেই খেয়ালটাই আমার নেই। তোমাদের

ব্রজেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে ইঙ্গিত করে, হাতের চেটোটা উল্‌টে দিলেন শূন্যে, তারপর বললেন, তুমি আমি কি করতে পারি, যে পোকা আগুনে পড়বে তাকে পড়তে দাও !

আবার নানা বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের তর্ক জমে উঠলো। শুধু রামকালীবাবু তর্কের সূত্র হারিয়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন।

ব্রজবিহারীবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

মালতী আবার বললে কাছে এসে, চলো বাবা ভাতগুলো কড়কড়িয়ে যাবে যে!

এই যে যাই, একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন তিনি।

তাদের যাওয়া লক্ষ্য করে ভাবলেন সুষমা: মেয়েটা সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে! এ বয়সে তাঁদের একটা ছেলে হয়ে গেছলো; কবে যে বিয়ের ফুল ফুটবে! সুরেশ ডাক্তারকে বেশ লাগে, ওই রকম একটি জামাই যদি তাঁর কপালে জুটতো; বড় ভাল মানায় মালতীর সঙ্গে। শরীরের কথা মনে পড়তেই তাঁর চোখ জলে ভরে এলো: একে সংসারের অনটন, তার ওপর এই ছ-মাস নিজে শয্যাশায়ি! শরীর ভাল থাকলে অন্তত গতর খাটিয়ে-ও সংসারের কতকটা সুবিধা করতে পারতেন, তাতেও ভগবান বাদ সাধলেন; কবে যে সুস্থ হবেন? মরণও হয় না, তা হলেও তো কতকগুলো পয়সা বাঁচে! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো সুষমা।

খাওয়া সেরে বাইরের ঘরে এলেন ব্রজবিহারীবাবু। জামাটা মাথায় গলিয়ে ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা বগলে নিয়ে বেরোতে যাবেন এমন সময় ব্রজেন্দ্রনাথের গলা শোনা গেলো।

ব্রজবিহারী বাড়ি আছ নাকি হে?

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, হ্যাঁ! এই যে আসুন।

তাঁকে দেখে স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, যাক্ দেখা হয়ে গেল, গতমাসের ভাড়াটা এখনও পাইনি তাই এলুম।

ভাড়াটা আপনার এই সপ্তাহ মধ্যেই দিতে চেষ্টা করবো। ব্রজবিহারীবাবু বল্লেন একটু ইতঃস্তত করে।

অনেকদিন হয়ে গেল, আমাদেরই বা চলে কি করে বাপু? আমাদের ওই ভাড়াই তো সম্বল!

সে তো ঠিক কথা, বাড়িতে অসুখের জন্যে বড় টানাটানিতে পড়েছি, আপনাকে এই হপ্তার মধ্যেই একমাসের ভাড়া শোধ দিয়ে দেবো !

বেশ এই হপ্তার মধ্যেই দিও। ব্রজেন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ভাড়া আদায় করতে গেলেন ; ব্রজবিহারীবাবু কাজে বেরোলেন।

হাতে ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে সুশ্রী, ফিট্‌ফাট্‌ একটি সুট্‌ পরা যুবক এসে কড়া নাড়লো। ভেতরে সুষমার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, মালতী দেখতো মা, কে যেন কড়া নাড়ছে !

মালতী খাওয়া সেরে হাত ধুচ্ছিলো ; সে কাপড়ে হাত মুছে, গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

ভেতরে এসে সুরেশ বললে, মাসীমা আছেন কি রকম মালতী ? তারপর তার মুখের দিকে চেয়ে বললে একটু হেসে, মুখ-ময় হলুদ যে ? খুব রান্না করা যাহোক !

মালতী লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলে ; দুজনে গিয়ে ঢুকলো সুষমার ঘরে।

বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে হাতটা তুলে নাড়ী দেখতে দেখতে সুরেশ বললে, এদিকে এসেছিলুম তাই একবার আপনাকে দেখতে ঢুকে পড়লুম, কেমন আছেন ?

সুষমা শুয়ে শুয়েই মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে বললেন নিম্নস্বরে, আমার জন্যে ভেব না বাবা, খুকীটার জ্বর আবার বেড়েছে, ওকে একটু দেখ।

তা নয় দেখছি—কিন্তু আপনার শরীর তো তেমন ভাল নেই মনে হচ্ছে ; অসুখটা খাচ্ছেন তো ?

অসুখ আজ তিন দিন ফুরিয়ে গেছে আর আনা হয়নি একথা বলতে বাধলো সুষমার, শুধু মাথা নাড়লেন।

সুরেশ ছোট খুকীর বুকে স্টেথিস্‌কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করলে।

তারপর আঙুল দিয়ে তার পেটটা বাজিয়ে বললে, মালতীর দিকে চেয়ে—কাগজ নিয়ে এসো, অষুধ লিখে দিচ্ছি।

সুষমা তারদিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন, কোটের কলারটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে সুরেশ—ও কিছু নয়, অষুধটা খেলেই জ্বর নেবে যাবে। মালতীর আনা কাগজে সুরেশ খচ্‌খচিয়ে লিখে যায়; সুষমার মনে হয়, আহা কেমন ছেলে! না বল্‌তেই কে এত যত্ন নিয়ে দেখে? ছেলেমানুষ হলে কি হবে, এরি মধ্যে কেমন পাকা ডাক্তার হয়ে উঠেছে! হীরের টুক্‌রো; মালতী কি আর ওর যোগ্য! এ যে আকাশকুসুম। কত মেয়ে ওর জন্যে তপস্যা করছে,—তা ছাড়া মেয়ের বাপেরা তো বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা বেঁধে রেখেছে! যত সব অসম্ভব ভাবনা কি তাঁরই?—বার বার নিজের কাছে নিরাশ হতে চান তবু যখনই সুরেশ মালতীর চোখ চোখে পড়ে তখনই তাঁর মনে নতুন করে ক্ষীণ আশা উঁকি মারে।

মালতী, সুরেশকে এককাপ চা করে দাও!

ও এই যেন চাইছিলো, ওর মনটা খুশিতে ভরে ওঠে, হাল্‌কা চোখে চায় মালতীর দিকে।

সুষমা বুঝতে চেষ্টা করেন সে চোখের ভাষা; অনেকদিন আগেকার ছুটো চোখ তাঁর মনে ভেসে ওঠে; তবে কেন হতাশ হবেন? সুরেশকে একবার বলে দেখলে কি হয়? না আজ থাক অন্যদিন।

যাও বাবা, এখানে রুগীর ঘরে কেন? বাইরের ঘরে বসোগে। তাঁর কথায় ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সুরেশ।

এককাপ চা হাতে করে ঘরে এসে ঢুকলো মালতী, সুরেশ তখন একটা বইয়ের পাতা উল্‌টোচ্ছে।

এরি মধ্যে মালতী তার চুলগুলো গুছিয়ে মুখখানি ধুয়ে নিয়েছে।

অষুধটা খাওয়ালেই জ্বর নেবে যাবে ; আমি তা হলে এখন আসি, কালকে আর একবার দেখে যাবো।

তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, এসো, আমি অষুধটা এখুনি নিয়ে আসছি। সুষমার ঘরে ফিরে গিয়ে, কোন কথা না বলে, ব্রজবিহারীবাবু একটা শিশি নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় মালতীকে হেঁকে বলে গেলেন, মালতী দরজাটা বন্ধ করো।

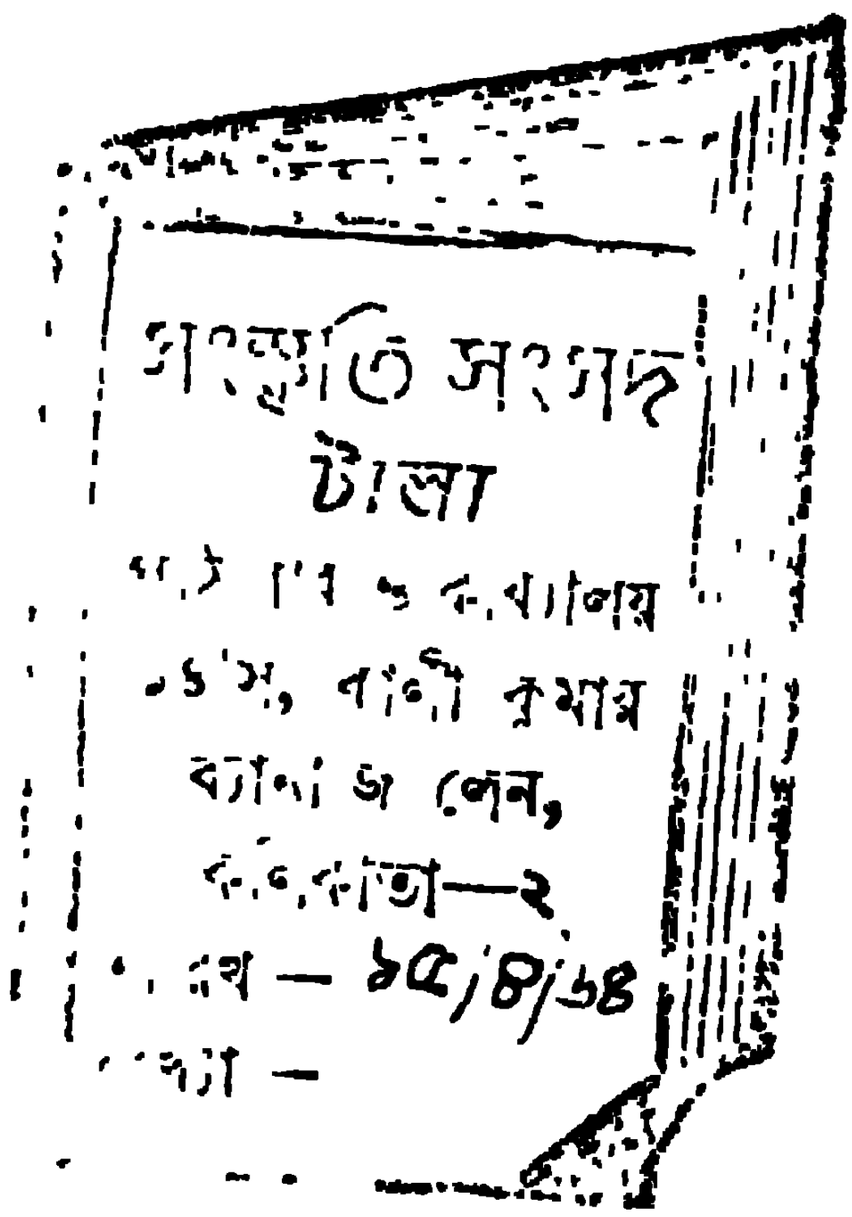

যাচ্ছিলেন তাড়াতাড়ি ললিতা সেখান থেকে উঠে চলে গেলো। বড়গিন্নি বললেন ননদের দিকে চেয়ে, সত্যি মেয়েটা বেশ বড় হয়ে গেছে। সেজকর্তা বিয়ে দিচ্ছে না কেন—পয়সার তো আর অভাব নেই, দিলেই তো পারে দেখে শুনে।

সেজগিন্নি আলু. কুটতে কুটতে এঁদের দিকে আড়চোখে চাইলেন। তারপর বললেন, ভাল পাত্র না হলে কি করে দি বলো দিদি ?

পাত্রর কি আর অভাব। তবে তোমাদের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট না হলে যে মন উঠবে না! বললেন বড়গিন্নি।

সাবিত্রী দেবী তাঁর কথায় সায় দিলেন, যা বলেছো—যাদেরই টাকা আছে তারাই খোঁজে আই, সি, এস্। এত আই, সি, এস্ জোটে কোথা থেকে বলো!

হাতে কতকগুলো রঙ্গীন শাড়ী ব্লাউজ নিয়ে গিন্নিদের আসরে এলেন ব্রজেন্দ্রনাথ; ছোটগিন্নির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রুনু কোথায় গেলো? জামাগুলো একবার গায়ে দিয়ে দেখে নিতে হবে।

ছোটগিন্নি উত্তর দিলেন মোমটা টেনে, এই যে কোথায় গেলো এখনও আসেনি।

কোথায় গেছে ? নিশ্চয় খেলতে! তুমি দেখছি মেয়েটার মাথা খেলে! বিরক্ত হয়ে বললেন তিনি।

বেগে বললেন ছোটগিন্নি, আমি কি করবো, আমার কথা শোনে নাকি ? নিজে সামলালেই তো পারো।

ব্রজেন্দ্রনাথ চুপ করে গেলেন;—তাঁর হাতের জামা কাপড়গুলো দেখতে লাগলো গিন্নির দল। মেজগিন্নি মুচকি হেসে বললেন, ঠাকুরপো, এইগুলো তুমি বিয়েতে দেবে নাকি ?

কেন কি হয়েছে ? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

রশ্মিরাশি তখনও চল্‌তি মেঘের কোলে দোল খাচ্ছে ; সেইদিকে চেয়ে বিমনা হয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হলো তারদিকে কে যেন চেয়ে রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে চাইতেই দেখতে পেলে, তাদেরই ভাড়াটে মনোহর ছেলেটা চেয়ে। অসহ্য লাগলো ললিতার ; আচ্ছা অসভ্য তো ছেলেটা, ওরকম করে চেয়ে থাকার মানে কি ?

ফিরে চাইতেই ললিতা দেখতে পেলে ছাতের অপরপ্রান্তে কে যেন গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে তার চেনা মনে হলো : মিনটু না ? হ্যাঁ তাইতো। সে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেলো সেই দিকে। প্রায় দেড় বছর হলো সে মিনটুকে দেখেনি, মিনটু অনেক বড় হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে ললিতা মিনটুর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলে। চম্‌কে চাইলো মিনটু, তারপর তাকে দেখে হেসে বললে, ললিতাদি, আমি ভাবছিলুম কে না কে !

কি করছো মিনটু চলো দুজনে বেড়াই। —তার কাঁধে আর একটা হাত চাপিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো ললিতা তার মুখেব দিকে। মিনটুও চাইল : অনেকদিন পরে সে দেখছে ললিতাকে, তার মনে হলো কি যেন বদ্‌লে গেছে,—ঠোঁটটা যেন বেশি লাল রং, আগের চেয়ে অনেক ফরসা দেখাচ্ছে, আর ভুরুগুলো তো এতো সুন্দর ছিলো না। গড়েরমাঠে দেখা মেমেদের মত ঠেক্‌লো মিনটুর।

তাকে আল্‌তো আকর্ষণ করে বললে ললিতা, চলো আমবা ছাতে পায়চারি করি। মিনটুর একটা হাত চেপে ধরে ছাতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বেড়াতে শুরু করলে ললিতা।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আবার ফ্যাকাশে হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের

দ্বিতীয়ার চাঁদ ক'লকাতার অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতেই, আলো এসে পড়লো ছাতে। ললিতা দেখলে, ঝাঁকড়া চুলের তলায় চঞ্চল চোখ দুটো তার মুখের ওপব দিয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। মদিরাক্ষী ললিতা দুহাত দিয়ে তাকে আকর্ষণ করে চেপে ধরলো বুকের ওপর। বিহ্বলতা কাটিয়ে মিনটু চেষ্টা করলো নিজেকে মুক্ত করতে: যৌবনের যাদুস্পর্শে রেখায়িত অল্পপরিসর খাঁজের মধ্যে তার মাথাটা বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে! ললিতার বুকের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে; হঠাৎ ললিতা নিচু হয়ে তাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলে, তার কানে এলো ললিতাদির অপরিচিত কণ্ঠস্বর, মিনটু, মিনটু। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে তপ্ত দেহটার থেকে তফাৎ করে নিয়ে সে ছুটে পালাল। ললিতা তার বেপমান শরীরটা আলসেব ওপর চেপে ধরে চাইল গঙ্গার চকচকে স্রোতের দিকে।

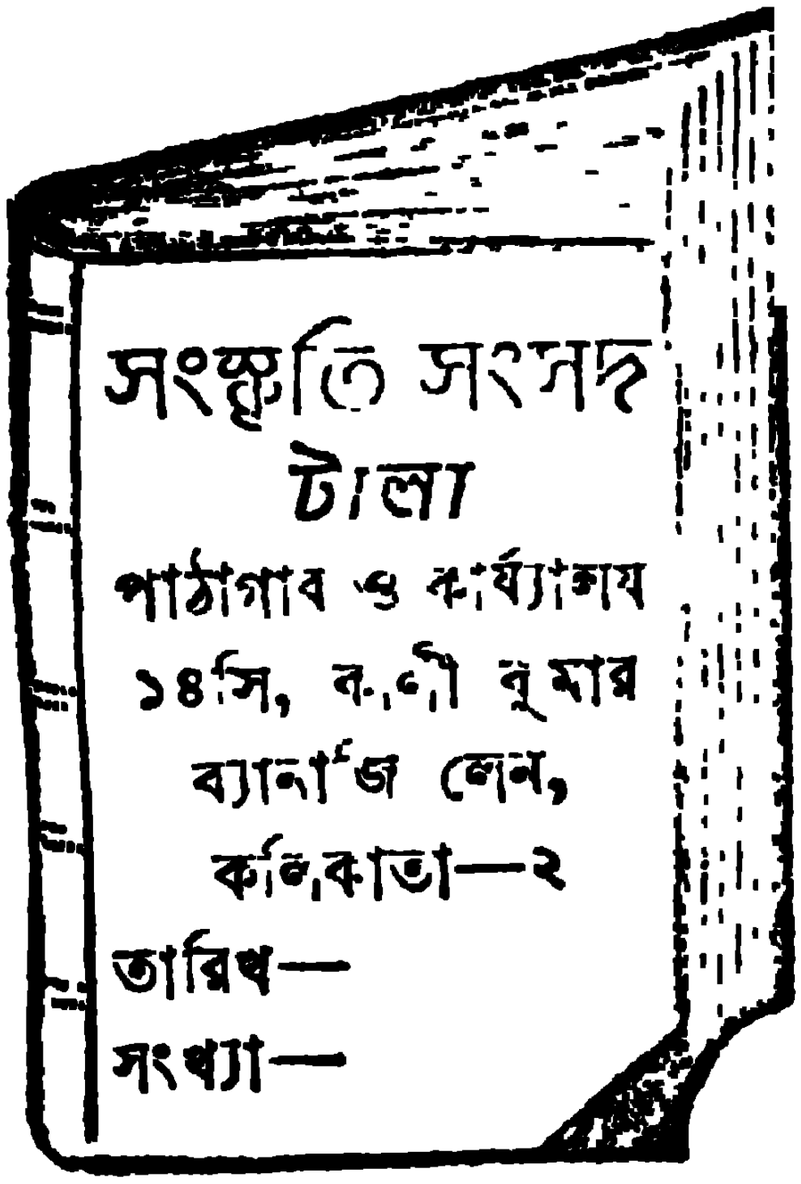

॥ ১০ ॥

সানাই বেজে চলেছে। শুধ্-সারেঙ্গএর করুণ মিড়ে, বিষাদিত মধ্যাহ্ন হয়ে উঠেছে বেদনাতুর। গত রাত্রের বিবাহবাড়ির উত্তেজনা ঝিমিয়ে এসেছে। সদর দরজার সামনে ডাস্টবিনে এঁটো গেলাস খুরি পাতার স্থানসংকুলান না হওয়ায় জমা হয়েছে রাস্তার এদিকে ওদিকে। একটি ভিক্ষুক তার আহার্য যোগাড়ের চেষ্টায় সেগুলো হাতড়াচ্ছে; ভিক্ষুকের ভাগীদারও জুটেছে রাস্তার হ্যাংলা কুকুর গোটা দুই, আর ছাতের ওপর বসা বায়সগোষ্ঠী। তাদের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো সে,—শালার এত কাকও আছে ক'লকাতায়! নিশ্চিন্দি মনে খেতে দেবে না দেখছি।

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানায় তখন চলেছে নতুন বৈবাহিকের সঙ্গে বচসা, বিবাহের দেনা-পাওনা নিয়ে।

ওপরের দালানে চলেছে কনে সাজানোর পালা, আর চাপা কান্নার ফোঁস্ ফোঁসানি।

অবশ্য বিয়ের পুর্বে এ বাড়ির বাসীন্দাদের মনে যতটা দুশ্চিন্তা ছিলো, তার সবটাই প্রায় কেটে গেছে বর দেখে; সুন্দর ছিপ্ ছিপে তরুণ বরের মুখের দিকে চেয়ে তাঁরা প্রায় সবাই তারিফ করেছেন,—কেউ কেউ মন্তব্যও করেছেন, আহা কেমন সুন্দর মানিয়েছে দেখ বরকনে, বিয়ে দিলে এই বয়সেই দেওয়া ভাল বাপু।

তবে বড়কর্তার কণ্ঠস্বর যেন খাদে নেবে গেছে আর শিবকালী-বাবুর মুখে ফুটে উঠেছে দার্শনিক নির্লিপ্ততা।

ছাতে চলেছে ছেলেদের জটলা। মিনটু, অমি, ললিত, চিত্ত, ভুতো, সকলেই বেশ মনমরা। বর, বরযাত্রী, বিয়ে সম্বন্ধে নানা রকম গুরুগম্ভীর মন্তব্য তারা সবাই মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করছে।

মধ্যে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, তাকে কাছে টেনে সান্ত্বনার সুরে বললে ললিতা, ছিঃ কাঁদতে নেই। নিজেকে সংযত করার নিষ্ফল চেষ্টায় ফুলে ফুলে উঠলো মিনটু। তাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে হাত বোলাতে লাগলো ললিতা। মিনটু তার মুখটা ললিতার বুকে চেপে ধরে যেন কতকটা শান্ত হলো। আকাশের টুকরো মেঘগুলো থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। ললিতা তার মুখটা দু-হাতে তুলে ধরে বললে, নেবে চলো মিনটু বৃষ্টি এলো।

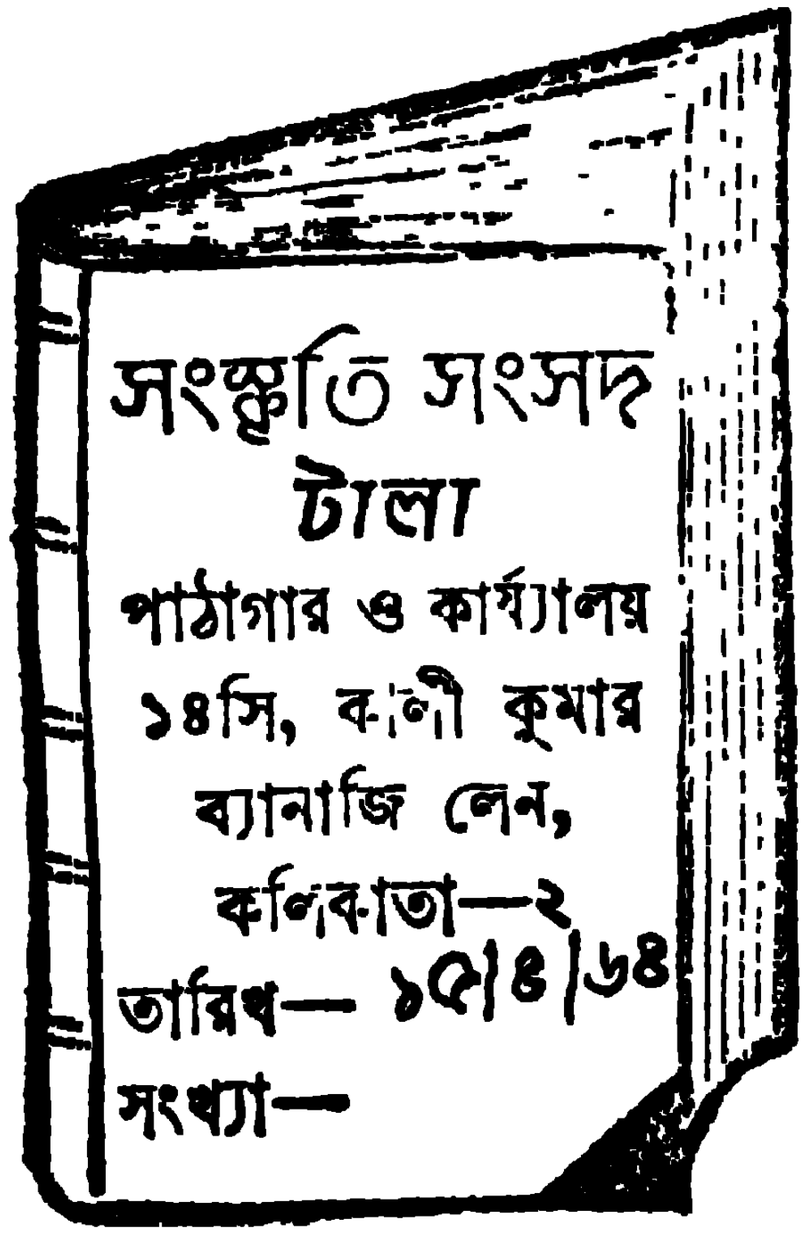

দ্বিতীয় সর্গ

গভীর রাত্রে এক একদিন সে আর সুজাতাদি যখন বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যায় কোন কাজে, পায়জামা, কোট আর পাগড়ী বাঁধা সুজাতাদির পাশে পাশে সে যখন হেঁটে চলে, জনমানবহীন নিদ্রিত ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায়, তখন তার কি যে ভাল লাগে, সে কথা সে কি করে বুঝাবে অমিকে। তার ইচ্ছে হয় অমিকেও এই কাজে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুজাতাদির নিষেধ; তিনি বল্লেন এখনও সময় হয়নি। দিনের পর দিন এ কাজ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে; ভবিষ্যতের কত ছবিই না সে কল্পনায় দেখতে পায়।

নিজের ঘরটার মধ্যে টেবিলের সামনে বই নিয়ে বসে অমিতাভ, বার বার তাকাচ্ছে সুজাতা দেবীর দরজার দিকে একটা অতিপরিচিত ইঙ্গিতের আশায়। আজ কদিন হলো সে সুজাতাদির ডাক পায়নি। তার মনে হচ্ছে হয় সে অজান্তে কোন অপরাধ করে ফেলেছে, নয় সুজাতাদির কোন বিপদ ঘটেছে।

হারাধনবাবু বাজার করতে বেরিয়ে যেতেই, সে উঠে পড়লো পড়া ছেড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে সুজাতাদির দরজার গোড়ায় গেল। দরজাটায় তালা লাগানো দেখে তার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—তবে কি এ-কদিন সুজাতাদি ফেরেন নি? আর তো সে বসে থাকতে পারে না! সুজাতাদির খবর আজ তাকে যোগাড় করতেই হবে। তার জানা যতগুলো আড্ডা আছে সবগুলো খোঁজ করে আসবে। সম্ভব অসম্ভব নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে সদর দরজা ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

প্রথম স্থানটিতে যেতেই তার সঙ্গে দেখা হলো অমলদার। তিনি ইসারায় তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন গলির মোড়ে। চারদিক চেয়ে চুপিচুপি বললেন, এখানে আর এসো না, পুলিশে নজর রেখেছে—আর কোথাও না গিয়ে বাড়ি যাও। ব্যাকুল ভাবে বললে

সে দেখলে, মোটরের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সেনাপতির পোশাকপরা একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষ ; মুখে মৃদু হাসি, চোখে নির্ভিক দৃষ্টি। বাঙ্গালীপল্টনের অধিনায়ক ; নাই বা রইলো অস্ত্র, মানুষতো আছে। তারপর এল ঘোড়ার সার—গাড়ী টানছে। তাই তো—গাড়ীর ওপর বসে বৃদ্ধ নেতা, খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে মিনটু, মতিলাল নেহরু।

রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেতে অমিতাভ বাড়ির দিকে পা বাড়ালে।

হারাধনবাবু কাগজ পড়ছেন, মৃণ্ময়ী দেবী পাশে বসে শুনছেন, অমিতাভ এসে ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে বললেন হারাধনবাবু, তুই কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াস ?

এ কথার উত্তর না দিয়েই বললে অমিতাভ, বাবা আজ আমাকে কংগ্রেস দেখাতে নিয়ে চলো : এই মাত্র দেখে এলুম কি সুন্দর শোভাযাত্রা গেল মতিলাল নেহরুকে নিয়ে !

তুই সেখানে গিয়ে কি করবি ?

না আমি যাব ! আবদারের সুরে বললে।

আচ্ছা সে দেখা যাবে !

হারাধনবাবু আবার কাগজ পড়ায় মন দিলেন, অমিতাভ খুশি মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দেশবন্ধু নগরের সামনে ট্রাম থেকে নামলো অমিতাভ হারাধন-বাবুর সঙ্গে। তার গায়ে খাকি খদ্দরের সার্ট আর হাপ্ প্যাণ্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। এ জায়গাটায় পুর্বেও একবার এসেছিলো কিন্তু তখন ছিল শুধু জঙ্গল। আজকে তার আলাউদ্দিনের প্রদীপের গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল আলোক স্তম্ভটার দিকে।

প্রদর্শনী দেখতে দেখতে যেন তৃপ্তি হচ্ছে না, সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে, এখানে অনেকেই বাবাকে চেনে। কথায় কথায় তাঁরা বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। একজন খুব রোগা লোক এসে বললেন, ওহে হারাধন, এবারে তুমুল কাণ্ড হবে! নেহরুর কোন আশা নেই, তাঁর রিপোর্ট পাশ হলে হয়!

তাই নাকি? বললেন হারাধনবাবু।

মনে তো হচ্ছে বাপ-বেটায় লড়াই চলবে, দেখা যাক, সুভাষও খুব গোঁ ধরেছে। কিন্তু এই নিয়ে একটা দলাদলি না হয়ে যায়! চিন্তিতভাবে বললেন হারাধনবাবু।

হাতের চেটো উল্‌টিয়ে বললেন ভদ্রলোকটি, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাশের রিপোর্ট পাশ হলে আমরা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবো, তারচেয়ে দলাদলি ভাল।

গাঢ়স্বরে হারাধনবাবু বললেন, না না ওটা ভুল, এখন দলাদলি করলে কোন লক্ষ্যতেই পৌঁছতে পারবো না!

সুভাষ কিন্তু মেনে নিতে রাজী নয়। দেখা যাক, চলো। গান্ধীবুড়ো আছেন, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়!

চিন্তিতভাবে এগিয়ে গেলেন হারাধনবাবু পেছনে পেছনে চললো অমিতাভ।

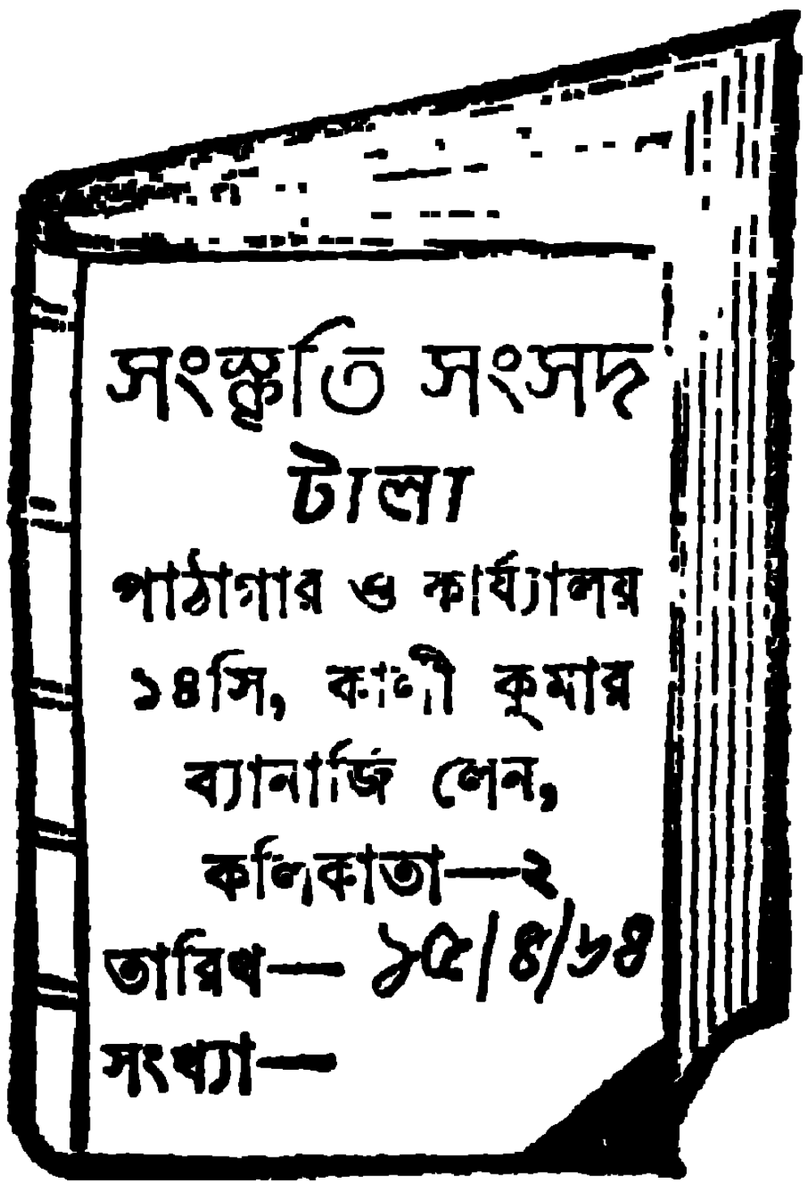

কাছাকাছি দেখলে অসংখ্য মজদুর কি নিয়ে যেন হৈচৈ করছে আর স্বেচ্ছাসেবকেরা করছে লাঠি নিয়ে আস্ফালন। তারা আরো এগোতে গেল এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে তাদের বাধা দিয়ে বললে, ওদিকে যেওনা মারামারি হতে পারে, কুলীরা গোলমাল করছে। কাজেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তারা। গোলমাল বাড়তে বাড়তে কমে এলো, প্যাণ্ডেলের ভেতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে এসে শান্ত করলেন কুলীর দলকে। তারা সবাই আবার জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরতে আরম্ভ করলো অমিতাভদেরই পাশ দিয়ে।

অমিতাভ আগ্রহে অধীর হয়ে সবায়ের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতে লাগলো। মনে হলো ছোট বলে তাদের যেন সবাই অবজ্ঞা করছে।

ভিড়ের মধ্যে আঙুল দেখিয়ে অমিয়কান্তি চিৎকার করে উঠলো, মিনটু, আমাদের ভাড়াটে সুরেন সিংহ ওই যে!

তাকে দেখে প্রাণপণ চিৎকারে হাঁকলে অমিতাভ, সুরেনদা ও সুরেনদা!

ভিড়ের মধ্যেদিয়ে সুরেনের চোখ পড়লো তাদের ওপর, সে এগিয়ে এলো সেই দিকে।

সুরেন সিংহের কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে, পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারাটা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁটে লেগে আছে একটা ক্ষীণ অদ্ভুত হাসি। তার হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ, কি হলো সুরেনদা এত গোলমাল?

উত্তেজিতকণ্ঠেই বললে সুরেন, আর বলো কেন ভাই! এরা দেশ স্বাধীন করবেন, আমাদের বাদ দিয়ে! আমাদের ভয় দেখায়! হাজার হাজার কুলী এক মিনিটে লোপাট করে দিতো সব। পোশাক পরে সেপাইগিরি ফলাচ্ছেন, ভাগ্যে আমরা ছিলুম নয়তো দেখিয়ে দিতো।

সুরেন সিংহের মুখের দিকে চেয়ে ভয় হতে লাগলো অমিতাভর, তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

ললিতকে পড়ার ঘরে বসিয়ে, মাকে গিয়ে সব কথা সে বললে। মৃণ্ময়ী দেবী একটা দশটাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললেন, এটা ললিতকে দাও তার বাবাকে দেবার জন্যে।

ইংরেজী নোটবই আর টাকাটা দেবার সময় অমিতাভ বললে ললিতকে, টাকাটা তোর বাবাকে দিস মা দিয়েছেন।

ভীত ত্রস্ত কণ্ঠে, নোটটা ফেরৎ দিয়ে বললে ললিত, আমি পারবো না ভাই। তুই জানিস্ না বাবা এতে ভীষণ রেগে যাবেন, পারিস তো তুই নিজে গিয়ে দিয়ে আয়। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমিতাভ ভাবছিলো কি করবে,—মৃণ্ময়ী দেবী ভেতর থেকে বললেন, মিনটু দিয়ে কাজ নেই ফেরৎ দে। মাকে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে অমিতাভ বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সে হেঁটে চললো অনির্দিষ্টভাবে।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটা মোড়ের মাথায় অমিতাভ দম নেবার জন্যে দাঁড়ালো, ক্লান্তিতে পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছে।

কি হে মিনটু এখানে দাঁড়িয়ে ?

সুরেন সিংহের স্বর কানে এলো, ফিরে তাকিয়ে দেখলে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এই এমনি, হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়ালুম, বললে অমিতাভ।

কোন কাজে নাকি ?

না এমনি বেড়াচ্ছি।

তবে চলো না আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়িয়ে আসবে।

বেশ চলুন। যেন একটু খুশি হয়েই বললে অমিতাভ।

কলিকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকার অন্তরালে যে সব নোংরা কদর্য খোলার বস্তিগুলো শহরের বুকে কালশিরার মত ছড়িয়ে তারই একটা সংকীর্ণ গলির মুখে সুরেন ঢুকে পড়লো। অন্ধকার

গলিটার মধ্যে নোংরা নেংটো ছেলেরদল দুর্গন্ধপুর্ণ নালার ধারে পরমানন্দে খেলছে। রাস্তার ওপরেই ছড়ানো আবর্জনা স্তূপের পাশ কাটিয়ে তাদের এগোতে হলো। খানিকটা দূরে, রাস্তায় খাটিয়া পেতে একজন লোক শুয়ে ধুঁকছে; তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে: শতছিন্ন কাপড়খানায় নিকষ কাল পাথরের মত দেহটার খানিকটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ভীরু দৃষ্টিতে তাকালো দুজনের দিকে; অমিতাভ জিজ্ঞেস করলে, লোকটির কি হয়েছে সুরেনদা?

যক্ষা! বড় শক্ত অসুখ, শুধু সেবার জোরে টিকে আছে, ওরা বড় কষ্টে পড়েছে ভাই।

কিন্তু রাস্তায় শুয়ে আছে কেন? বিস্মিত কণ্ঠে বললে অমিতাভ।

ওদের ঘরে তো জানালা নেই, অথচ ডাক্তার বলেছে আলো বাতাসে রোগীকে রাখতে হবে, কাজেই.....থেমে গেল সুরেন।

একটা জায়গায় একটি পুরুষ, মেয়ে সেজে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান গাইছে, তাকে ঘিরে কতকগুলি লোক হল্লা করছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ধেনো মদের উৎকট গন্ধ অমিতাভর নাকে এলো, সে বললে বিরক্তভাবে, এরা এতো গরীব কিন্তু মদ খেতে তো ছাড়ে না সুরেনদা।

জীবনে ওদের কোন স্থায়ী আনন্দ নেই বলেই তো এই অস্থায়ী আনন্দ-লাভের চেষ্টা। একটু মুচকি হেসে বললে সুরেন।

অমিতাভ তার কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে চুপ করলো।

ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজে পড়া এইতো প্রফিট-এর নগ্ন রূপ! এর জন্যে সে শুধু বিদেশী-শাসন ছাড়া আর কোন কিছুকেই দায়ী করতে পারলে না, উন্মত্তের মত একটা নিঃশ্বাস ছাড়লে অমিতাভ।

সুরেনের সঙ্গে সে একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেখানে দেখলে, ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর অতিমলিন ট্রাউজার, ও সার্টপরা একজন ইংরেজ বসে। মুখের রং ঝলসানো তামাটে, একটা ময়লা

যখন শুয়ে পড়লো তখন সামনের রাস্তা দিয়ে একদল লোক একটি মৃত দেহ নিয়ে চলেছে—বলহরি হরিবোল।

বড় আদরের রুনু। তার জীবন এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? সমস্ত শক্তি দিয়েও সে নিজেকে সামলাতে পারছে না।

• •

অপরাহ্ন পর্যন্ত অমিতাভকে ফিরতে না দেখে মৃণ্ময়ী দেবী রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন: সকাল থেকে কোথায় যে গেল। একজন লোকও তেমন পাচ্ছেন না যাকে দিয়ে খোঁজ করবেন। মিত্তিরবাড়ির দালান থেকে তখনও মাঝে মাঝে গোঙানির শব্দ আসছে। তিনি ভাবলেন: আহা এতটুকু কচি মেয়ে পাঁচটা বছরও পেরোল না। হতভাগীর এরি মধ্যে সারাজীবনের সাধআহ্লাদ শেষ হয়ে গেলো।

অমিতাভ যখন বাড়ি ফিরলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাকে দেখে প্রচণ্ড ধমকের সুরে বললেন, হতভাগা ছেলে কোথায়... তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই মৃণ্ময়ী দেবীর কথায় ছেদ পড়ে গেল। রক্তজবার মত চোখদুটোর কোলে কে যেন এক পোঁচ কালি লেপে দিয়েছে। বালি ভর্তি চুলগুলো জটার মত কপালময় ছড়িয়ে।

মাকে দুহাতে জড়িয়ে-ধরে অবোধ্য কণ্ঠে কি যেন বলে উঠলো অমিতাভ। তার কথার মানে না বুঝতে পেরে মৃণ্ময়ী দেবী ভাবলেন: আহা খেলার সাথী তাই মনে বড় আঘাত পেয়েছে। তিরস্কারের ভাষা ভুলে তাঁকে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে হলো।

মা গো মা! হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে দুজনেই চমকে চাইলেন দরজার দিকে।

টলতে টলতে ঘরে ঢুকলো রুনু: একবছরের মধ্যেই তার কল্পনাতীত পরিবর্তন লক্ষণীয়; ঝরনার মত চঞ্চলতা বালুচরে এসে লুপ্তপ্রায়! বিশীর্ণ মুখ, শূন্য দৃষ্টি।

বিস্ময় কাটিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কি হয়েছে রুনু হঠাৎ.....কোন কথা না বলে তাঁদের দুজনের দিকে চেয়ে রুনু পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দিলে। দগদগে আঘাতের দাগ প্রকাশ হয়ে পড়লো।

এক চাপা আওয়াজ করে রামকালীবাবু কাছে গিয়ে দেখলেন, তারপর যেন গর্জন করে উঠলেন, ভজা! ভজা! আমার লাঠি-গাছটা নিয়ে আয়! নবীন মিত্তিরের রক্তের ধারা যেন টগবগ ফুটে উঠলো, কাঁপতে কাঁপতে তিনি দুহাতের মুঠো চেপে ধরলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন রুনুকে, তাঁর চোখ দিয়েও দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ওপর থেকে নেমে এলেন গিন্নির দল, অমিয়কান্তি, অমিতাভ, আর ভজুয়া লাঠি হাতে।

রামকালীবাবু বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি আজ দেখে নেব ছোটলোকটাকে, মিত্তিরবাড়ির মেয়ের গায়ে হাত তোলা আমি ওদের জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো।

দরজা দিয়ে এগোতে গেলেন তিনি, রুনু পথ আগলে দাঁড়ালো। সে মিনতিভরা কণ্ঠে বললে, না জ্যাঠাবাবু ওখানে যেও না। শুধু আমায় তোমাদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আমি পালিয়ে এসেছি, রামকালীবাবুর বুকে মুখ লুকিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আশ্বস্থ হয়ে বললেন তিনি, বেশ তাই হবে। সেই ব্যবস্থা

করছি, ব্রজেন, এখুনি যাও, থানায় একটা ডায়রী করে এসো। তারপর অন্য ব্যবস্থা আমি করবো।

ব্রজেন্দ্রনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুনুর মাথায় একটা হাত রেখে রামকালীবাবু বললেন, ওপরে যাও মা। আর কেউ আমাদের কাছ ছাড়া করতে পারবে না। রুনু আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে দরজায় দাঁড়ানো মায়ের কাছে দাঁড়ালো। অমিতাভ দেখলে রুনুর পিঠে তখনও রক্ত বিন্দু বিন্দু ফুটে আছে। সে তাড়াতাড়ি অমিয়কান্তির হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গভীর রাত্রে ব্যস্তভাবে মৃণ্ময়ী দেবী, অমিতাভ, হারাধনবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো ললিত নিজেদের অংশের দিকে।

অমিতাভর পাশে দাঁড়িয়ে বললে সে, জানিস মিনটু, সকাল থেকেই মায়ের বুকের ব্যথাটা বেড়ে গেল। তখন থেকেই ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে আর অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন।

সমস্ত বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে অমিতাভ। কোথাও আলো জ্বলছে না, বাইরের ঘরে ব্রজবিহারীবাবু বসে আছেন আড়ষ্ট ভাবে, তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন হারাধনবাবু। অন্য সবাই ভেতরের ঘরে প্রবেশ করলো।

শয্যায় শায়িত সুষমা। হলদে মুখের ওপর মুদ্রিত চোখের পাতার কাল চুলগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিবিড় আরামে বুঝি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে যাচ্ছেন।

পায়ের কাছে মুখে আঁচল গুঁজে বসে মালতী। একটা টুলে বসে সুরেশ ডাক্তার। কোণের দিকে মিটমিটে হ্যারিকেন জ্বলছে।

সবাই যেন ক্ষীণ আলোছায়ার অন্তরালে, নির্মম মৃত্যুর লুকোচুরি প্রত্যক্ষ করলো।

মৃণ্ময়ী দেবী সুরেশ ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন মনে হচ্ছে ?

হাতের ইসারায় জানিয়ে দিলে কোন আশা নেই। খাটের পাশে গিয়ে তিনি কপালে হাত দিলেন সুষমার। সুষমার চোখ খুলে গেল, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে বললেন খুব ধীরে, দিদি এসেছো ? তোমার সামনেই কাজটা সেরেনি, হয়তো আর সময় হবে না। মানে না বুঝে সবাই চেয়ে রইল তার দিকে। সুষমা হাতের ইসারায় ডাকলেন সুরেশকে : তারপর দম নিয়ে বললেন, অনেকদিন তোমায় বলবো করে বলা হয়নি—মালতীর ভার তুমি নাও বাবা।

জড়িত কণ্ঠে বললে সুরেশ, তার জন্যে কি—সে সব হবে এখন।

অপলক দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চেয়ে বললেন সুষমা, কথা দাও বাবা।

ইতস্তত করছে দেখে মৃণ্ময়ী দেবী তারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন, সুরেশ একটা ঢোক গিলে বলে ফেললে, কথা দিলুম মাসিমা।

আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো, ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা। আরামে চোখ বুজলেন সুষমা একবার, তারপর হাত বাড়িয়ে মালতীর একটা হাত নিয়ে সুরেশের কম্পিত হাতের ওপর রাখলেন, মালতীর ক্লান্ত চোখদুটো সুরেশের মুখের ওপর পড়লো, সুরেশের মুখখানা তখন যেন অতিমাত্রায় লাল হয়ে উঠেছে।

সুষমার ক্ষীণ দেহটা একবার জোরে দুলে উঠলো। মৃণ্ময়ী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, কষ্ট হচ্ছে সুষমা ?

না দিদি শুধু যেন হাওয়া নেই মনে হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সুষমা। ক্রমে তাঁর হাঁপানি বেড়ে উঠলো, একটু হাওয়ার জন্যে কি আকুলতা। জল থেকে তোলা মাছের মত হা করেও বুঝি হাওয়া মেলে না।

তাঁর কোন সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না, আটহাতি কাপড়টা একটু দেরীতে ধোপার বাড়ি যায়, এই যা।

দালাল নিবারণ জানা আজকাল প্রায়ই স্ত্রীর ওপর ক্ষোভ মেটায়।

বাঁ-দিকের কলতলা ঘেঁষে যে পরিবারটির বাস, তাঁদের আদর্শ পারিবারিক শান্তিতেও চিড় ধরেছে। বড় ভাইয়ের চাকরী গেছে ছাঁটাইয়ের দৌলতে, মেজ ভাইয়ের মাহিনা কমেছে আর ছোটভাই মনোহর, মাষ্টারী করছে একটা স্কুলে, যে টাকার রসিদ দেয় তার অর্দ্ধেক নিয়ে বাড়ি ফেরে। চেহারার চক্‌চকে ফিটফাটত্ব ম্যাড়-ম্যাড়ে হয়ে এসেছে।

ব্রজবিহারীবাবু স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই দুনিয়াকে কলা দেখাবার লোভে নেশা ধরেছেন। রোজগার যা হয় তার সবটাই প্রায় খরচ করে, যৎসামান্য মালতীর হাতে দিয়ে বলেন, এতে না কুলোয় সুরেশের কাছে নিও, আসছে মাসে শোধ দিয়ে দেব। সুরেশ আজকাল এ পরিবারের ভারকেন্দ্র। মালতীকে বিবাহ করা অপেক্ষা তার সান্নিধ্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এবং সেই কারণেই আর্থিক উদারতা তার কাছে বিরোধহীন। মালতীকে তার ভাল লাগে, কিন্তু শুধু সেই পুঁজির জোরে বিবাহবন্ধন তার কাছে যুক্তিযুক্ত নয়। ললিত ছেলে ভাল না হলেও ছবি আঁকার গুণে কর্তৃপক্ষের কাছে ফ্রী-সিপ্‌ যোগাড় করেছে এবং বন্ধুমহলে বই ধার করে কোন রকমে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

হারাধনবাবুর ছোট পরিবারে এখনও অশান্তির আঁচ লাগেনি তবে ন্ময়ী দেবীর স্নেহভীরু মনে অমিতাভ সম্বন্ধে অজানা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই এ-নিয়ে তাঁর আলোচনা চলে., কিন্তু যখন দেখেন, পিতাপুত্রের মধ্যে এমন সব আলোচনা চলছে যা সন্তানকে বহির্মুখান করার পক্ষে যথেষ্ট তখন তিনি হাল ছেড়ে

॥ ৮ ॥

ক্লাসের বেঞ্চিতে বসে অমিতাভ। প্রফেসর মুখার্জি পড়িয়ে চলেছেন ইংরাজি সাহিত্য : ছেলেদের মনোযোগের অভাব, উত্তেজনায় তারা চঞ্চল! বর্তমানের প্রতি দিনটা এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনার গৌরবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে যার সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া তরুণ ছাত্রদের পক্ষে অন্তত অসম্ভব!

অমিতাভর পাশের ছেলেটি একটা খবরের কাগজের ছবির দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বললে, দেখ অমিতাভ গান্ধীজির ডাণ্ডী অভিযান। অমিতাভ প্রফেসরের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছবিটি দেখলে, পড়ে গেল মহাত্মা গান্ধীর উন-আশীজন সত্যাগ্রহী সহ লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশে ডাণ্ডী অভিযান। দেখলে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন একদল স্বাধীনতার সৈনিক। স্বতন্ত্রতায় দীপ্ত তাঁদের মুখশ্রী : সম্মুখে বক্রদেহ, দণ্ডধারী কটিবাস পরিহিত সেনাপতি চলেছেন, বীরোচিত পদক্ষেপে,—মুখে ক্ষমা ও নমতা মাখানো অটুট সংকল্প!

সে ভাবলে, এই তো ভারতের অভিনব যুদ্ধ ঘোষণা। পরাধীন জাতির নিঃশস্ত্র বিদ্রোহ। ত্যাগ, আত্মাহুতি ও মহৎ বীরত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত স্বাধীনতা সংগ্রাম।

তার মানসচক্ষে ফুটে উঠলো বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র, কোটী কোটী বীর সৈনিকের জয়গর্বিত পদক্ষেপ। ভারতের প্রাত গ্রামে, নগরে, রাজপথে, পল্লীপথে, প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণে নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ।

সে ফিরে চাইল সহপাঠিদের দিকে। পড়াতে পড়াতে প্রফেসর মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছেন ছেলেদের গোলমালে। আজ তিনি কোন রকমে কর্তব্য শেষ করতে পারলেই বাঁচেন।

হঠাৎ বাইরে সমবেত জনতার চিৎকারে ক্লাসের ছেলেরা চম্‌কে

কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে তখন হেঁকে চলেছে, বন্দে মাতরম্‌ ; স্বাধীন ভারত কি জয় ; মহাত্মা গান্ধীকি জয় ; প্রফেসরের সম্মতির অপেক্ষা না-রেখে হুড়মুড় করে সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা বেরিয়ে গেল বারান্দায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে জনতা উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করলে, গোলামখানা বন্ধ হোক ! গোলামি মন লুপ্ত হোক !

ছেলেরা ছটফট করে উঠলো, একটা অস্ফুট গুঞ্জনে ভরে উঠলো কলেজ সীমানা।

অমিতাভর মনে চাবুকের মত এসে পড়লো, গোলামখানা বন্ধ হোক ! কলেজের চারিদিকে সে চাইলে। এই তো শুভ মুহূর্ত !

ক্লাস থেকে বই খাতা বগলে নিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ! কলেজের গেটের কাছে গিয়ে শেষবারের মত ফিরে তাকালো কলেজটার দিকে ; একটা ব্যথার চিড়িক লাগলো মনে ; সামলে নিয়ে সে এগিয়ে চললো।

কলেজ স্কোয়ারের ধারে সত্যাগ্রহী অফিসের সামনে এসে দেখলে, তার মত বহু ছেলে আগে এসে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে। নাম লিখিয়ে নির্দেশ শুনে বাড়ি ফিরে আসতে অমিতাভর বেশ একটু দেরী হলো !

সামান্য একটু হিংসার আঁচ পেলেই অচল হয়ে যাবে আন্দোলন, সেরকম গণআন্দোলন অসম্ভব !

এ সম্বন্ধে গান্ধীজি ঠিকই করেন, কারণ সাধারণ-লোক নির্বোধের মত বাড়াবাড়ি করে বসলে, গান্ধীজি কেন' কেউই তাদের ফেরাতে পারবে না !—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন জোর'গলায় ।

বিরক্ত হয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কেন বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, নেমন্তন্নের ফর্দটা সেরে ফেললে তার চেয়ে কাজ হবে ।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, দেখ মেজদা গান্ধীজির খদ্দরের বাতিকটা যদি না থাকতো তো ভাল হতো, দেশকে বড় করতে হলে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন, চরকায় দেশের দুঃখু ঘুচবে না ।

শিবকালাবাবু দার্শনিক ভঙ্গীতে বক্তৃতার সুরে বললেন, ওটার মধ্যে যে কতবড় মঙ্গলময় সত্য লুকিয়ে আছে তা তুমি বুঝবে না জ্ঞান, তুমি তোমার ব্যবসা বুদ্ধি দিয়েই দেখছো !

যথা ?—একটু ঠাট্টার সুরে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ।

সমগ্র জগতের শান্তির ও মুক্তির জন্যে অমূল্য ভারতীয় ভাবধারা ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ সত্য রূপে নিহিত রয়েছে, তোমাদের পাশ্চাত্য বিলাসী মন ও অর্থ বুঝবে না !

ভারত স্বাধীন হলে ও তত্ত্বকথা কেউ মনে রাখবে ভাব ? গান্ধীজির বড় চেলারাই তখন যন্ত্র-আমদানির কাজে উঠে পড়ে লাগবেন । স্বাধীনতা বড় প্রশ্ন,তাই আজ ওপ্রশ্ন ধামাচাপা পড়েছে !

হতাশভাবে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন শিবকালীবাবু, ওই তো, ওইখানেই আমরা ভুল করি—গান্ধীজিকে বুঝতে হলে তাঁর সমস্ত জড়িয়ে বুঝতে হবে নয়তো তাঁর কাজেরও হদিস পাব না, সিদ্ধিলাভও সম্ভব নয় !

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, থাক ! তর্ক রেখে এখন একটা কাজের কথা জিগ্যেস করি,

॥ ১০ ॥

অমিতাভ ঘরে বসে ভাবছে, কি ভাবে কথাটা মায়ের কাছে পাড়বে। এই সামান্য ব্যাপারটা তার কাছে ক্রমে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাবা, মা, দুজনেই যদি বাধা দেন? মা যদি বেশি কান্নাকাটি করেন। দারুণ অসোয়াস্তিতে সে চাইলে জানালার দিকে।

ললিতার আজ বিয়ে। অমিয়কান্তিদের বাড়িতে সবাই কর্মব্যস্ত। খুব ধুমধাম হবে; পেলেটির বাড়িতে নাকি সেজকর্তা অর্ডার দিয়েছেন। সে দেখলো, ললিতা রুনু এসে বাঁদিকের ঘরটায় ঢুকলো—বাঃ ব্যবহারে মনে হচ্ছে রুনু বড় বোন, ললিতা ছোট! ব্যবহার কেন, দেখেও মনে হচ্ছে রুনু বড়। রুনুকে এত বড় মনে হচ্ছে কেন? রুনুর সামনে আজকাল যেতে বাধ বাধ ঠেকে। দুত্তোর! যত বাজে চিন্তা। আবার সে ডুবে গেল নিজের সমস্যায়।

ঘরে এসে অমিতাভকে অন্যমনস্ক দেখে অমিয়কান্তি টেবিলে একটা চাপড় মেরে বললে, এটেন্‌সান্!

ঘাড় ফিরিয়ে হেসে সে বললে, তুই এসে গেছিস অমি, আমি এই মাত্র তোকেই যেন চাইছিলুম।

ওটা খোসামুদি, অভিমানের সুরে বললে অমিয়কান্তি।

মোটেই নয়! তবে তোর সঙ্গের জন্যে নয়, সাহায্যর জন্যে।

বটে! অহিংস সৈনিকের আহ্বান শুনে সুখী হলুম বীর।

তাকে একটা চাপড় বসিয়ে বললে অমিতাভ, ঠাট্টা রাখ তোকে একটা কাজ করতে হবে—মাকে আমার কলেজ ছাড়া, সত্যাগ্রহীদলে নাম লেখানো, সব কথা জানাতে হবে।

বটে? মানে প্রথম ঝালটা আমার ওপর দিয়েই চালিয়ে দিতে চাও।

মানে, কাজটা করতেই হবে। বাবাকে আমি নিজেই বলতে পারবো।

আমি পারবো না। জোর দিয়ে বললে সে।

ঝগড়া হয়ে যাবে অমি!

হোক!

দুজনেই গোঁ হয়ে বসে রইল। শেষে অমিয়কান্তিই প্রথমে কথা বললে, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। কবে যেতে হবে তোকে কাঁথি?

দু একদিনের মধ্যেই; এখনও ঠিক হয়নি।

অমিয়কান্তি মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করলে।

তোর ইচ্ছে করে না অমি আন্দোলনে যোগ দিতে? জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ তার দিকে চেয়ে; কোন উত্তর না পেয়ে তাকে ঠেলা মেরে আবার বললে, কিরে কথা বলছিস না যে?

ইচ্ছে করে কিন্তু কলেজ ছাড়তে আমার আপত্তি, ওটা পারবো না।

তা পারবি কেন? সব ব্যাপারই স্বাভাবিক থাকা চাই তা সত্ত্বেও যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায় আপত্তি নেই কেমন?

তাই কি আমি বলছি, ভারীগলায় বললে সে।

ঘরের মধ্যেটা থমথমে হয়ে উঠেছে; দু-জনেই চুপচাপ, দু-জোড়া চোখ পরস্পরের মুখের ওপর দৃষ্টির-জ্যোতি ফেলে ফেলে সরে যাচ্ছে।

দুজনেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যখন ঘরে এসে ঢুকলেন হারাধনবাবু।

ধীর শান্ত-গতিতে তিনি এসে একটা চেয়ারে বসলেন: কপালে চিন্তার রেখা, যোদ্ধার মত কঠিন মুখেও অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, মিনটু আমি এক পরিচিত বন্ধুর কাছে শুনলুম তুমি কলেজ ছেড়ে সত্যাগ্রহীদলে যোগ দিয়েছ।

একটার পর একটা রেঁধে চলেছেন :—ছেলেটা আজ কাঁথি যাবে, কোথায় থাকবে কি খাবে তার ঠিক নেই, যাবার দিনটায় ভাল করে খাইয়ে তো দি। ভাবতে ভাবতে হাতের খুন্তিটা মাঝে মাঝে থেমে যায় ; তা দেখে ছোটখুকি বলে ওঠে,—মা, তরকারি পুড়ে যাবে !

স্নানের সময় অমিতাভ দু তিনবার উঁকি মেরে গেছে রান্না ঘরের দিকে কিন্তু মায়ের মুখের চেহারা দেখে সে কিছু বলতে সাহস করেনি।

স্নান সেরে হাতপা ছাড়িয়ে বসে আছে, ছোটখুকী এসে ডাকলে ; তার চুলগুলো দু-হাতে এলোমেলো করে দিতে দিতে বললে, অমিতাভ, চল।

খাবার জায়গায় বসতে গিয়ে দেখলে অদ্ভুত কাণ্ড। থালার চার-পাশে অন্তত আটটা তরকারির বাটি, রূপোর রেকাবীতে মিষ্টি, ফল, পাথরের দুটো বাটিতে দই রাবড়ী। পাখা হাতে বসে মৃণ্ময়ী দেবী।

তুমি কি আমায় রাক্ষস ঠাউরেছ মা ? এত খাব কি করে ? হেসে ফেলে বললে অমিতাভ মার দিকে চেয়ে।

যা পারিস খা !—তাঁর যেন গলা ধরেছে মনে হলো।

খেতে খেতে সাহস সঞ্চয় করে বললে অমিতাভ, তুমি খুব রাগ করেছ না মা ?

কেন ?

এই যে আমি কাঁথি যাচ্ছি, পড়া ছেড়ে দিলুম !

মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন মৃণ্ময়ী দেবী প্রায় মনে মনে, আমি জানতুম।

দুটিমাত্র কথা কিন্তু ছুরির মত বিঁধলো অমিতাভকে।

নীরবে খেয়ে চললো সে।

সামনে, নির্ভীক যোদ্ধার মত এগিয়ে, বিনা প্রতিবাদে বুক পেতে দিতে হবে।

কুড়িজন সত্যাগ্রহী সার বেঁধে দাঁড়ালো। সামনে নেতার হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাওয়ায় দুলছে।

সমবেত কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল।

নেতা আদেশ দিলেন, আগে বাড়ো।

সত্যাগ্রহীর দল সামরিক কায়দায় এগিয়ে চললো।

অমিতাভ দেখলে, রাস্তায় দুধারে পথিক, দোকানদার, গৃহস্থ, সবাই তাদের দিকে চেয়ে আছে! নীরব চোখে তাদের আশীর্বাদের বাণী—জয়যুক্ত হোক তোমাদের অভিযান।

মুহূর্তে মনের মেঘ বৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেল; অনিরুদ্ধ বাসনা এতদিনে সার্থক হতে চলেছে। হাত দুলিয়ে পা মিলিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সে সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠলো—

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

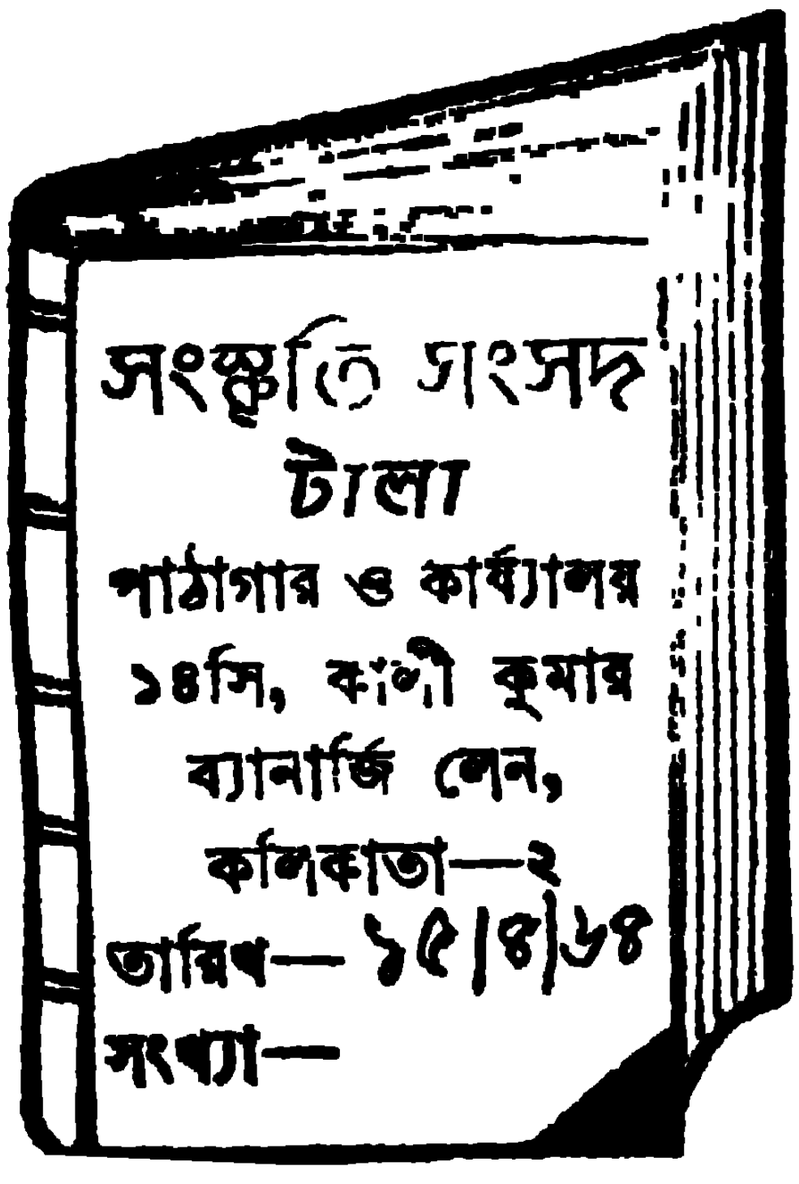

॥ ১ ॥

কণ্টাই রোড স্টেশন। রাত্রির অন্ধকার বিদায় নিচ্ছে; বেগুনে আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে লাল কাঁকড় বিছানো ছোট স্টেশনটি।

জনহীন, নিস্তব্ধ; তেলের বাতিগুলো তখনও জ্বলছে।

আকাশে বেগুনে আলো, মিটমিটে বাতি, টেলিগ্রাফের ক্ষীণ ধাতব শব্দ, সবগুলো জড়িয়ে অনন্ত অনুভূতি অমিতাভর মনে।

সত্যাগ্রহীরা ট্রেন থেকে নামবার পর নেতার কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো বন্দেমাতরম্। প্রতিধ্বনি হলো কুড়িটা কণ্ঠে।

সাড়া পড়ে গেল স্টেশনে। স্টেশনমাষ্টার বেরিয়ে এলেন; তাঁর হাতের গোল আলোটা তখনও জ্বলছে। অন্য কর্মচারীরা এসে ছড়িয়ে দাঁড়ালো, সাধারণলোকরা এসে ঘিরে নিলে সত্যাগ্রহীদের।

তারা কোন কথা জিজ্ঞেস করবার পূর্বেই একজন বললেন, আপনারা কাঁথি যাবেন তো? রাস্তায় ওই-যে বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওতেই আপনাদের যেতে হবে।

তাঁকে একটা নমস্কার ক'রে আদেশ দিলেন নেতা, আগে বাড়ো!

দুটো সারি এগিয়ে চললো।

রাস্তায় বাসচালকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে নিয়ে যাবে; সবাই বলতে শুরু করেছে,—আমার জানা আছে আমি নিয়ে যাবো!

চালকদের মধ্যে কোন আপোসের সম্ভাবনা না দেখে আদেশ দিলেন নেতা, আমাকে অনুসরণ কর!

ভিড় ঠেলে নেতার পেছনে পেছনে সমগ্র দলটি উঠলো সামনে দাঁড়ানো একটি বাসের মধ্যে।

তখন বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। দু'পাশে বিসর্পিত কাটা ধানজমি

॥ ২ ॥

কেন্দ্রীয় সত্যাগ্রহ শিবিরে, চব্বিশ ঘণ্টা থাকার পর অমিতাভদের প্রতি একটি লিখিত নির্দেশ এলো—সুধীর সেনের নেতৃত্বে তাদের চারজনকে বেলা চারটের সময় পিছাবনকেন্দ্রে রওনা হতে হবে। পথপ্রদর্শক একটি স্বেচ্ছাসেবক তাদের প্রয়োজন হলে সঙ্গে যেতে পারে। নিচে অধিনায়কের সই। সুনির্মল সকলের দিকে চেয়ে বললে, এখানে কাল শুনলাম পুলিসের রোখ পিছাবনী কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি।

ভালতো একেবারে সেরা কেন্দ্রে হাজির হবো। তোমার কি ভয় করছে সুনির্মল? বললে সুধীর তাকে ইঙ্গিৎ করে। না না ভয় নয়, আমাদের অভিজ্ঞতা নেই তাই ভাবছি। চল ভাই অভিজ্ঞতা হতে কতক্ষণ? তার পিঠে একটা চাপড় মেরে অমিতাভ বললে।

বিদেশে বিপদের মুখে বন্ধুত্ব জমে ভাল। এরাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশ পরস্পরকে আপনার করে নিয়েছে।

বেলা চারটের সময় তাদের প্রস্তুত হবার আহ্বান এলো পথ-প্রদর্শক এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। রওনা হলো তারা চারজন।

কাঁথি শহরের মধ্যে দিয়ে বুক টান করে চললো ধ্বনি দিতে দিতে।

শহর ছেড়ে পিছাবনীর পথে হাঁটতে হাঁটতে তারা মাঝে মাঝে গাছের তলায় বসলো।

হাঁটায় অনভ্যস্ত সবাই তবু কেউ কারুর কাছে হার মানবে না এই পণ। যেতে যেতে সুখময়ের স্যাণ্ডেলের ফিতেটা গেল ছিঁড়ে; বিরক্ত হয়ে পায়ের থেকে খুলে ধুলোশুদ্ধ সেটা ব্যাগের মধ্যে ভরে নিতেই সবাই হেসে উঠলো।

একবার সুনির্মল বিশ্রাম করবার সময় গাছে হেলান দিয়ে তার ধুলাধুসরিত পায়ের দিকে চাইল ; তার মুখখানাও একটু শুকিয়ে গেছে। ঠাট্টার সুরে সুখময় বলে উঠলো, কি হে পা কন্‌কন্ করছে নাকি, টিপে দেবো ?

লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ে বললে সুনির্মল, মোটেই না, চলো।

একটা গান হলে ভাল হতো ! বিভূতি বললে সুধীরের দিকে চেয়ে। সুধীর গান জানে, কিন্তু গান গাইলে পাছে নেতার মর্যাদা নষ্ট হয় সেই জন্যে স্বীকার করেনি ! শেষে বিভূতি নিজেই তার ভাঙ্গা বেসুরো গলায় গান শুরু করে দিলে—যায় যেন জীবন চলে জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে.....

তার গলার সুরে চেঁচিয়ে উঠলো বিভুতি, ওরে বাবা, ছাই চাপা আগুন ! ফুর্তিতে সুরে-বেসুরে চেঁচিয়ে চললো পাঁচজন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না ; শুধু তারা বুঝলে রাস্তার ধারে খড়ের একটা বড় চালার দরজার কড়া নাড়লো পথ প্রদর্শক।

রোগা, লম্বা, কাল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে রূপোর চশমা হাটুর ওপরে কাপড় পরা, খালিগায়ে একটি লোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

তাকে উদ্দেশ্য করে পথপ্রদর্শক বললে, এদের পাঠিয়েছেন এই কেন্দ্রের জন্যে। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সে মিশিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটি বললেন, তোমরা ভেতরে এসো।

না এতে হাসি পাবার কি আছে ; ওদিকে পুলিশ আসেনি। ওই খানেই ওরা থাকে, ওটা অস্থায়ী থানা, বললেন তিনি।

অবাক কাণ্ড, পুকুরের এপাড়ে সত্যাগ্রহী শিবির, ওপাড়ে পুলিশের থানা! দুজনেই হতবাক হলো।

এদিকে জনশূন্য ছাউনিটা তখন সত্যাগ্রহীতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। খালি গায়ে ; ছোট ছোট কাপড় পরা, ছেলের দল, প্রায় সব একই রকম দেখাচ্ছে!

একটি ছেলে এসে ঈশ্বরবাবুকে বললে, ঈশ্বরদা, ওই গ্রামের নবীন ওঝার এক হাজার মন ধান আর খামার ভর্তি খড় পুলিশে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে!

কেন?

সে নাকি সত্যাগ্রাহীদের সাহায্য করতো।

তারপর—শান্তভাবে বললেন তিনি।

একদিনে আগুন নেভাতে পারেনি! তিনদিন পরে আগুন যখন নিভলো তখন এক কণাও অবশিষ্ট নেই! ছেলেপিলে নিয়ে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনলে অমিতাভ ; ঈশ্বরবাবুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই ; তুমি সাইকেলে এখুনি কাঁথিতে এইখবরটা জানিয়ে এসো—ছেলেটি দ্রুতগতিতে চলে গেল, তিনি অমিতাভদের দিকে চেয়ে বললেন, চলো তোমাদের নুন পরিষ্কার করা শিখিয়ে দি, ওই কাজই তোমাদের এখন করতে হবে।

পিঠটা একটু বেঁকিয়ে তিনি অফিস ঘর থেকে বেরোলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুনির্মল অমিতাভও চললো।

মরিয়া হয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠলো অমিতাভ, আমরা বাড়ি যেতে চাইনি ঈশ্বরদা, কোন সক্রিয় কেন্দ্রে আমাদের পাঠাবার কথা বলছি ।

মুহূর্তে ঈশ্বরদার মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো তিনি বললেন, তাই বলো ! আমি ভুল বুঝেছি, বোস বোস ! দেখি কি করতে পারি ।

খুশিমনে বসলো দুজনে । ঈশ্বরবাবু তাঁর পাশের ফাইলগুলো ঘেঁটে নামের তালিকা বার করলেন । সেগুলো অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, কোথাও তো খালি নেই তবে সুধীরদের কেন্দ্রে দু-জনকে বদলি করা যেতে পারে । কিন্তু.....

উৎসাহিত ভাবে বললে অমিতাভ, ওইখানেই না হয় পাঠিয়ে দিন!

ওখানে তোমাদের পাঠানো আমার ইচ্ছা নয়—চশমাটা খুলে চিন্তিত ভাবে বললেন তিনি ।

কেন ঈশ্বরদা ?

ওখানের কাজ শক্ত ! অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি ।

সুনির্মল না হয় থাক, আমাকে ওইখানেই পাঠিয়ে দিন ! জোর গলায় বললে অমিতাভ ।

অভিমানে বললে সুনির্মল, কেন তুমি যেতে পারো আর আমি যেতে পারবো না !

তাদের ভাব দেখে হেসে ফেললেন ঈশ্বরবাবু তিনি বললেন, ঝগড়া নয় ! ঝগড়া নয় ! কালকে তোমাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে । অনেক রাত হয়েছে এখন ঘুমোওগে, কাল ভোরবেলা প্রস্তুত হয়ে থাকবে ।

তিনি আবার চশমা চোখে লাগিয়ে গীতা পড়তে শুরু করলেন । অমিতাভ আর সুনির্মল একানড়ের মত পা ফেলে ফেলে বেরিয়ে গেল ।

॥ ৫ ॥

সকালে ব্যাগ ঝুলিয়ে, টুপী-পরে, প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালো সুনির্মল, অমিতাভ, ঈশ্বরদার অফিসের সামনে।

তাদের দেখে চিন্তিতভাবে বললেন ঈশ্বরদা, নেহাৎ যাবে?

দুজনে কোন কথা না বলে মাথা হেলালো। একটি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন ঈশ্বরদা, সুধীরের কেন্দ্রে এদের দুজনকে পৌঁছে দিয়ে এসো—সেই সঙ্গে তাদের রিপোর্ট ও নিয়ে আসবে। তিনজনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ঈশ্বরদা।

পুকুরের পাড় দিয়ে যেতে যেতে অমিতাভ একবার ভুরু কুঁচকে চাইল থানাটার দিকে। সুনির্মল শিবিরের দিকে ফিরে চাইতেই, দেখতে পেলে ঈশ্বরদা তখনও তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; সে বললে, অমিতাভকে, ঈশ্বরদা এখনও দাঁড়িয়ে।

অমিতাভ চাইল সেইদিকে, তারপর দুজনেই হেসে হাত তুলে আবার এগিয়ে গেল। পথপ্রদর্শক ছেলেটি ততক্ষণে ধানমাঠের আলের ওপর নেমে পড়েছে।

মেঠো রাস্তায় খানিকটা যাবার পর তারা এসে উঠলো উঁচু রাস্তায়। রাস্তাধারে একটা ছোট বসতি পেরিয়ে, আবার নামালো ধানজমিতে।

দুজনেরই আলে হাঁটা অভ্যাস নেই; পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এরি মধ্যে পা ফোস্‌কে দু-তিনবার আছাড় খেয়েছে।

মাঠের শেষে একটা বড় নারিকেল গাছের বাগানে উঠলো তারা। বড় বড় ছাতার মত নারিকেল গাছগুলো সে-জায়গাটাকে প্রায় অন্ধকার করে রেখেছে। গুটিকতক মুসলমান চাষী, গান্ধীটুপি-পরা ছেলেদের

হুজন এখানে কাজ করবে,—ঈশ্বরদা কদিনের রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সুধীরের চোয়ালের হাড়গুলো যেন আরো চোয়াড়ে হয়ে গেছে, কপালে একটা কাটা দাগ, রং হয়ে গেছে তামাটে। সুখময়, বিভূতি তাদেরও চেহারা বদলে গেছে।

অমিতাভ, সুনির্মলের দিকে চেয়ে আকর্ণ হেসে বললে সুধীর, এইতো চাই, দেখবো এইবার বীরত্ব!

এক পোঁটলা নুনমাটি দিয়ে সুধীর বললে পথপ্রদর্শককে, এটা জমা দিও, অনেক কষ্টে আজ বাঁচিয়েছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে সে চাইতেই বিভূতি বললে, পুলিশে উনুন ভেঙ্গে দেবার সময় সুধীরদা ওটা বুকের তলায় নিয়ে শুয়ে পড়েছিল, শ্রীবপুকে হুতিন জন পুলিশে মাটি ছাড়াতে না পেরে গোটা হুয়েক কোঁৎকা মেরে ছেড়ে দিলে। সবাই হেসে উঠলো সেই কথায়।

সুধীর রাগের ভান করে বললে, আমি এদিকে কোমর কন্‌-কনানিতে গেলুম আর ওঁরা হাসছেন, এসো তোমরা আমার সঙ্গে। হাসতে হাসতে সবাই তাকে অনুসরণ করলো।

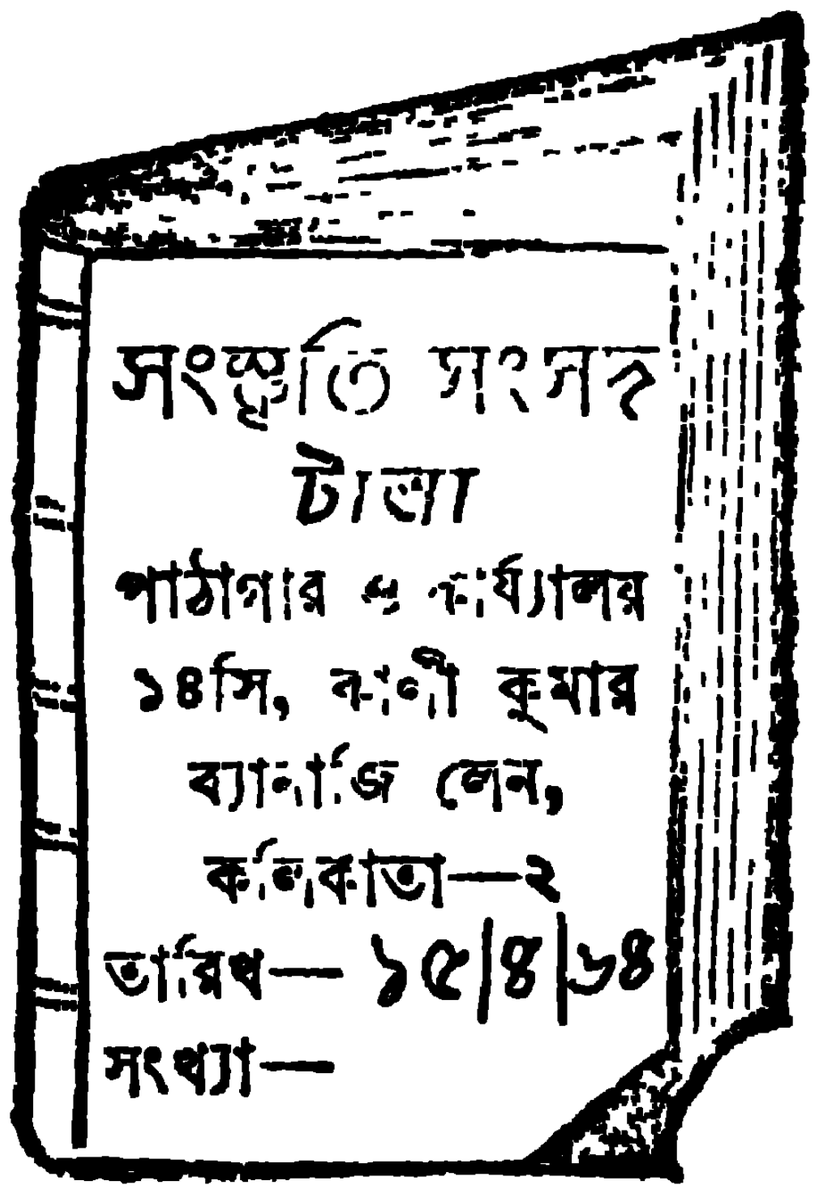

অমিতাভ লক্ষ্য করলে সোনাদির কথায় এ দেশের টান নেই। ফেরার সময় সে জিজ্ঞেস করলে সুধীরকে—সোনাদির বাড়ি কোথায় সুধীরদা ?

বিলেত !—এই মাত্র ওঁরই বাড়িতে খেয়ে এলে বুদ্ধিমান।

কিন্তু কথা বলার...

প্রশ্নের আসল দিকটা বুঝে বললে, মেদিনীপুর শহরে বাপের বাড়ি—এখানে শশুর বাড়ি। বুঝেছো ?

॥ ৭ ॥

শীর্ণ স্রোতস্বিনী : চৈত্রের, দেউলিয়া নদী চলেছে ধীর মন্থর গতিতে সমুদ্র মিলনে ; অহঙ্কারে স্ফীত নয়, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মদ গর্বিত গতি নয় ; এ যেন আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল, লজ্জা-জড়িত সার্থক মিলনের আনন্দে কল-কল ধ্বনি মুখরিত অভিসারে যাত্রা।

সমুদ্র দূরে নয় : তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে লবণাক্ত ঝোড়ো হাওয়ায়, আর এ তল্লাটের বাসীন্দাদের উদার প্রশস্ত মানসক্ষেত্র।

নদীরই বুকের চড়ায় ব'সে, স্রোতের দিকে চেয়ে অমিতাভ : যে সংগ্রাম শুরু হলো আজ, তারই অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত। নূতনত্বের কৌতূহলে ভরা সমগ্র পরিবেশ।

নুন সংগ্রহ করার করণীয় খুটিনাটি সেরে ডাকলে সুধীর, এসে বসো তোমরা চারপাশে, ওদের আসার সময় হয়ে গেছে।

সবাই গিয়ে ঘিরে বসলো, গ্রাম্য পদ্ধতিতে নুন করবার জন্যে গড়া খেলাঘরের উনুনের মত ঢিপিগুলোর সামনে।

বাঁশি বাজলো : কাটা কাটা তীব্র কম্পিত। সুধীর আদেশ দিলে, প্র—স্তুত্। পুরাতন সত্যাগ্রহীদের মুখে ফুটে উঠলো একটা রুক্ষ দৃঢ়তা ; নবাগতদেব মুখে,—কৌতূহল ভাবালুতা ও চঞ্চলতা।

তারা পরস্পরের হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে, জড় হয়ে নুনের ঢিপির ওপর ঝুঁকে পড়লো। দারোগার ইঙ্গিতে পুলিশদল সাবধানী পদক্ষেপে এসে ঘিরে দাঁড়ালো সত্যাগ্রহীদের।

নিম্নস্বরে সুধীর বললে, ওরা ভাঙতে এলেই শুয়ে পড়বে।

দারোগা আদেশ দিলেন, তোড় দেও। নিমক ছিন লেও।

পুলিশদের বিরক্ত মুখগুলোয় অনিচ্ছাজনিত শিথিলতা : তারা নিচু-গলায় ভাঙা বাংলায় বললে সত্যাগ্রহীদের, উঠিয়ে বাবু উঠিয়ে, কেয়া

তা হলে আজকের মত বৈঠক ভাঙ্গা যাক। বললে অমিয়কান্তি সকলের দিকে চেয়ে। সবাই একে একে উঠে দাঁড়ালো।

ললিত জিজ্ঞেস করলে, অমি মিনটুর মায়ের খবর কি?

এখন সামলে নিয়েছেন, মিনটুর একটা চিঠি এসেছে, সে ভাল আছে রোজ নুন তৈরি করছে।

সবাই চলে যাবার পর অমিয়কান্তি সিঁড়ি দিয়ে নিজেদের অংশে নেবে গেল তার পড়ার ঘরে। বৈঠকখানা থেকে ডাকলেন রামকালী বাবু, অমি এদিকে শুনে যাও!

অমিয়কান্তি গিয়ে দাঁড়ালো পিতার সামনে। রামকালীবাবু তাকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন, বসো তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অমিয়কান্তি জড়সড় হয়ে বসলো, বাবার কণ্ঠস্বর আজ বিশেষ অর্থ-পুর্ণ। খানিকটা থেমে বললেন তিনি, দেখ অমিয় তোমার বয়স কম এখন লেখাপড়া করার সময়। এমন সময় ডেকে এই কথাটি শোনাবার মানে খুঁজলে অমিয়কান্তি, তিনি চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বললেন আবার, আমি শুনলুম তুমি কতকগুলো স্বদেশী ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করছো, এমনকি সময় মত বাড়ি আসছো না, মিটিং করে বেড়াচ্ছ—তোমরা যে নিজের মঙ্গল বোঝ না এটা বড় দুঃখের ব্যাপার।

কোন কিছু না বলে অমিয়কান্তি ভেবে নিতে চেষ্টা করলো কার খবরে কথাগুলো বাবার জানা সম্ভব হয়েছে। তাকে নীরব থাকতে দেখে ধমকের সুরে বললেন, রামকালীবাবু, চুপ করে রইলে কেন, উত্তর দাও?

আমি এমন কিছু করি না যাতে পড়ার ক্ষতি হতে পারে!—কঠিন সুরে বললে সে।

করো না মানে? এই তো তোমার ছোটকাকা দেখেছেন তুমি খদ্দরপরা কতকগুলো স্বদেশী ছেলে নিয়ে ছাতে মিটিং করছিলে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে অমিয়কান্তি একটা কড়া জবাব সংযত

কথাগুলো ঠিক হলেও সবটা অমিতাভ মেনে নিতে পারে না। সোনাদিকে ভাবলে তার সুজাতাদিকে মনে পড়ে যায়। বাইরে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও ওরা যেন একই সুত্রে গাঁথা। একদিকে স্নেহাতুর, অন্যদিকে শৃঙ্খলিতা বিদ্রোহী। পাশাপাশি আরো দুটো মুখ ভেসে ওঠে, এঁরাও কি এক ?

অমিতাভ নদীর পাড়ে এসে পড়লো। অন্যমনস্ক ভাবে নেমে গিয়ে দাঁড়ালো ছেলেদের পাশে।

সুধীর তাকে দেখে বললে, আজ তুমি না এলেই পারতে অমিতাভ, আমরা তোমাকে ওই জন্যেই ডেকে আনিনি।

এখানে আসাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে না এসে পারলুম না সুধীরদা।

সুধীর কোন কথা না বলে টিপি করার কাজে মন দিলে।

পাড়ে দেখা গেল পুলিশের দল। অভ্যস্ত সত্যাগ্রহীরা মুহূর্তে সাজিয়ে নিলে নিজেদের টিপির চারিদিকে। সুধীর চকিতে পাড়ে দাঁড়ানো দারোগার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, আলি সাহেব এসেছে—সাবধান।

অমিতাভ সুখময়ের মুখে একটু চঞ্চলতা লক্ষ্য করে বললে তার হাতটা চেপে ধরে, এখনও ভয় ? ছি সুখময়।

আলি সাহেব বেত দোলাতে দোলাতে নেমে এলো : পিশুন মুখ বসন্তের দাগে ভর্তি, নাকের গোড়াটা ভাঙ্গা, ডগাটা উঁচু ; ডেবডেবে লাল চোখ, চোয়ালের হাড়গুলো থেকে চিবুক পর্যন্ত নেবে এসেছে একটা হিংস্র কুঞ্চন।

নিস্তব্ধ ছেলের দল পরস্পরকে আঁকড়ে বসে আছে ; পুলিশরা তাদের ঘিরে দাঁড়ালো।

চিৎকার করে উঠলো আলি সাহেব, শুয়োরের বাচ্ছারা, ঘরে ভাত নেই এখানে এসেছে মরতে, আর আমাদের জ্বালাতে।

সপাং শব্দে বেতটা এসে পড়লো বিভূতির কাঁধে ; থর থর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত শরীরটা, চোখ বুজে গেল তার। তেরি... বলে একটা অকথ্য গালাগাল দিয়ে আলি সাহেব বেত চালাতে শুরু করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের তরবারি ঘোরানোর অনুকরণে বেত ঘুরতে রইল ডাইনে, বামে! অন্যদিকে অবশ্য সর্বংসহা মাটিকেও লজ্জিত করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে সত্যাগ্রহীরা।

অমিতাভ মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে রইল : সপাং সপাং শব্দের ছন্দে, তার দেহে একটা করে শিহরণ হচ্ছে, পিঠের ওপর যেন শত শত ক্রুদ্ধ বোলতায় হুল ফোটাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চিপে সে নিশ্বাস বন্ধ করলে। খানিক পরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় গড়াতে গড়াতে নদীর কিনারে গিয়ে পড়লো, তারপর গাঢ় অন্ধকার, সংজ্ঞাহীন নিরবতা।

আলি সাহেব থামলেন : ক্লান্তিতে তার হাতটা ঝুলে গেল, কপাল দিয়ে গলগল করে ঘাম গড়িয়ে তার বিভৎস মুখটা আরো হিংসালু করে তুলেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে লক্‌লকে জিবটা দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে তিনি হুকুম দিলেন পুলিশদের, চলো। তারপর টলতে টলতে পাড়ের ওপর উঠে গেলেন।

বহু কষ্টে ঘাড়টা তুলে হাঁকলে সুধীর, সুনির্মল, বিভূতি, সুখময়, অমিতাভ। সবাই আস্তে আস্তে মাথা তুলে উঠে বসলো, অমিতাভ ছাড়া।

নরনারী নির্বিশেষে গ্রামের সমস্ত লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মুখে বেদনা, ঘৃণা, ক্রোধ যেন একই সঙ্গে ফুটে বেরোচ্ছে।

পিঠের জলন্ত রেখাগুলোর কথা ভুলে সত্যাগ্রহীরা অজানা আশঙ্কায় ছুটে গেল অমিতাভর কাছে।

নিজের ঠোঁটে একটা কামড় দিয়ে দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, সোরে যাও বল্‌ছি নয়তো আমায় জোর করে ঢুকতে হবে।

সোনাদির শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে, মাথার ঘোম্‌টা খসে রাশি রাশি কাল চুল সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে বুকটা। বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছেন চৌকাট।

হারামজাদী স্বদেশীদলে ঢুকেছে! ওরা তোর কোন জন্মের .....কথাটা চেঁচিয়ে শেষ করলে একটা অকথ্য কথা জুড়ে।

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন সোনাদি দারোগার দিকে।

জ্বরের ঘোরে চমকে উঠলো অমিতাভ। অপচ্ছায়ার মত দৃশ্যটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে।

দাঁড়া তোর স্বদেশীপণা ছাড়াচ্ছি।

সজোরে একটা চড় এসে পড়লো সোনাদির মুখে! প্রচণ্ড উত্তেজনায় দুর্বল শরীরটা তুলতে গিয়ে অমিতাভ পড়ে গেল মুখ গুঁজে।

এক ধাক্কায় সোনাদিকে মাটিতে ফেলে প্রায় তাঁকে মাড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেল দারোগা।

চাষীরদল একটা হিংস্র চিৎকার করে উঠলো!

দারোগা ভেতরে উল্লাসে হাঁকলো,—এই যে একশালা শুয়ে! শালা আবার গোঁ গোঁ করছে।

উন্মাদের মত হাতড়াতে হাতড়াতে এসে নিজের শরীরটা দিয়ে অমিতাভকে ঢেকে মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন সোনাদি,—একে মেরো না তোমরা! জ্বরের ঘোরে বেহুস্ হয়ে পড়ে আছে—একে ছেড়ে দাও! একে ছেড়ে দাও!

থমকে গিয়ে দারোগা একবার সোনাদির মুখের দিকে চাইলে, তারপর ধীরপদে বেরিয়ে গেল—গলি পেরিয়ে সোজা রাস্তায়!

চাষী একজন বলে উঠলো,—যাও বাছা কি করবো, গান্ধীজির নিষেধ নয়তো ফিরতে হতো না!

ঘরে এসে ঢুকলো নির্মল ইত্যাদি ছেলের দল, অমিয়কান্তি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো।

গম্ভীরভাবে বাড়ির ভেতর থেকে মেসিনটা এনে ছেলেদের হাতে দিতে দিতে বললেন তিনি, যাও এটা সরিয়ে দাও, এরপর আর আমি সামলাতে পারবো না বলে দিচ্ছি!

যাঁকে চিরকাল অশ্রদ্ধা করে এসেছিলো তাঁর মহত্বের নিদর্শন পেয়ে পরমোৎসাহে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ছেলের দল। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তাদের মন।

।। ১২ ।।

বাংলার গোপনতম পল্লীস্রোতস্বিনীর ধারে দৈনিক হয়ে চলেছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ বিকাশ।

তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে বৃহত্তর সম্ভাবনা নিয়ে রোজকার মত আজও বসে সুধীর, অমিতাভ, বিভূতি, সুখময়, সুনির্মল।

সামান্য মাটির ঢিপির মধ্যে জীবনের মূল্যবান মর্মকথাকে মূর্তি দেবার মানসে যেন পাঁচটি জাটায়ু পক্ষ-বিস্তার-করে, ধীরে ধীরে স্ফুটনোন্মুখ তাদের অতি প্রিয় ভবিষ্যৎকে বলদর্পী রাবণের শ্যেন-দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়।

শালারা একটা দিনও কি কামাই দেবে না! চাবুকের চোটে পিঠে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেল তবু তেলানি যায়নি, দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি! পাড়ে আগত দারোগা চিৎকার করে উঠলো।

বেতটা হাওয়ায় ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে নেবে এসে দারোগা অমিতাভর ফতুয়াটা একটা হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললে, তারপর আদেশ করলেন পুলিশদের, সব শালাকো কাপড়া ফাড়ো।

চমকে উঠলো সত্যাগ্রহীরা; অমিতাভর মুখেও কিসের যেন চাঞ্চল্য। নিজের শরীরটা আপ্রাণ-শক্তিতে গুটিয়ে সে দম ধরে পেটের কাপড়ের বাঁধনটা শক্ত করে নিলে। পুলিশবাহিনীর চললো ধস্তাধস্তি।

দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়নি: হয়তো নারী বলেই ব্যাসদেবের কিছুটা দুর্বলতা ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষ, এবং এমন পুরুষ যাদের মন্ত্র: রাগ, লজ্জা, ভয় তিন থাকতে নয়, কাজেই দ্বাপরের পরাজিত গ্লানি মুছে গেল কলিতে, অন্য ছদ্মবেশে।

অল্প সময়ের মধ্যেই সত্যাগ্রহীদল সমতল ভূমিতে নাগা সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করলো।

ভেতর থেকে একজন পদস্থ কর্মচারী রাগে গরগর করে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, একটা ঢোক গিলে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললেন, কেন গোলমাল করছো। চলে যাও।

চিৎকার উঠলো, যেতে আমরা প্রস্তুত, কাপড় দাও।

নিস্ফল আক্রোশে জুতোটা মাটিতে ঠুকে তিনি ভেতরে ফিরে গেলেন—ভেতর থেকে আদেশ শোনা গেলো, মারকে হাটা দেও। কে একজন পুলিশ উত্তর দিলে, সরম লাগতা সাব্ এ ক্যাইসে হো স্যাকৃতা।

বাহিরে চিৎকার বেড়ে উঠলো, বন্দেমাতরম্, কাপড় দাও।

এই গোলমালে পুকুরের ওপারে পিছাবনী শিবিরে সাড়া পড়ে গেছে। যত সত্যাগ্রহীরা সেখানে এই নাগা দৃশ্য দেখবার জন্যে উঁকি ঝুকি মারছে আর মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপছে। ব্যতিব্যস্ত ঈশ্বরবাবু, এই দৃশ্য দেখতে না দেওয়ার অক্ষম চেষ্টায় ছেলেদের কোন রকমে সামলাতে না পেরে শেষে শিবিরের বাইরের দিকের দরজাটায় শেকল তুলে দিলেন। কড়া নীতিবিদ্ ঈশ্বরদার বর্তমান অবস্থা দেখে মায়া হলো অমিতাভর, এমন কি তিনি নিজে একবারও নাগাদের দিকে চাইছেন না!

সূর্য পশ্চিমে হেলে গেলো অনেকটা, তবু সভ্যসবকারের প্রতিনিধিদের কাপড় দেবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; যাওবা দু এক-জন মাঝে মাঝে তাঁবু থেকে উকি ঝুকি মারছিলো তাও বন্ধ হয়ে গেছে। খানটা একটা মৃত অজগরের মত নিঃসাড়ে পড়ে, ক্ষতবিক্ষত উলঙ্গ দেহগুলোর অপরাজেয় দীপ্তিতে যেন সেটার বিষাক্ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে।

পিছাবনী শিবির থেকে একটা ছেলে মাথা নিচু করে এসে বললে, ঈশ্বরদা আপনাদের শিবিরে ফিরতে বলছেন।

নিজেদের শিবিরের সীমানায় আসতেই তারা দেখলে ঈশ্বরদার

অদ্ভুত অবস্থা। তাদের দিকে সম্পূর্ণ পেছন ফিরে তিনি বললেন, সুধীর, তোমরা ওই গাছের তলায় দাঁড়াও একটা ফটো তুলে পাঠাতে হবে।

অমিতাভর হাসি পেল ঈশ্বরদার এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গী দেখে, সামনে চোখ তাই চক্ষুলজ্জা বজায় রেখেছেন, ইন্দ্রদেবের মত সহস্র চক্ষু হলে ফ্যাসাদে পড়তেন।

সুধীর বললে হেসে, ঈশ্বরদা আপনি ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, পাঁচ ছয়-ঘণ্টা এই অবস্থায় থেকে আমাদের আদিম অবস্থা প্রাপ্তি হয়েছে, যারা দু মাইল রাস্তায় শত লোকের সামনেও নির্ভিক ছিল তারা কি আপনার কাছেই হার মানবে ?

না না তা নয় এই আমি ফটো-গ্রাফারকে ডেকে আনি।

জড়িতকণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে ঈশ্বরদা পালালেন। ফটো-তোলার ব্যাপারে অমিতাভ সুনির্মল ঘোর আপত্তি জানালে ; অমিতাভ বললে, এ হয় না, এ সম্ভব শুধু এই পরিবেশের গৌরবে কিন্তু এটাকে চিরস্থায়ী করা বড় লজ্জাজনক।

ঈশ্বরদা ফটোগ্রাফার নিয়ে এলেন। অবশ্য এবারেও তিনি তাঁর পুরোনো পদ্ধতি ছাড়েননি ; তাঁর বেঁকা পিঠের দিকে লক্ষ্য করে বললে অমিতাভ, এ হয়না ঈশ্বরদা এ পারবো না।

পারতেই হবে, এ ছবির মূল্য অনেক। ভবিষ্যতে ওরা অস্বীকার করতে পারবে না ওদের এই বর্বোরোচিত ব্যবহারটা।

অগত্যা মুখগুলোকে যতদূর সম্ভব নিচু করে ঘুরিয়ে পাঁচজন সার-বেঁধে দাঁড়ালো। একটা চিড়িক শব্দে চিরদিনের জন্যে প্রামাণিক হয়ে উঠলো তাদের এই নাগা অভিযান।

একজন এসে পাঁচখানা কাপড় তাদের হাতে দিলে, তারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেগুলো জড়িয়ে নিয়ে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

সরল সহজ হয়ে এসেছে। এক ঢোক পেটে পড়তেই যেন জীবনের মানে খুঁজে পেলেন, খুশিমনে একটা বিড়ি পকেট থেকে বার করে ধরালেন।

ঘরে এসে ঢুকলো সুরেশ। তার হাবভাবে আর সংকোচের কোন বালাই নেই, সোজা গিয়ে পাশে একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসে বললে সে, আজ এখনও কাজে বেরোননি আপনি, শরীর খারাপ নাকি?

এই যে এইবারে যাবো, ললিতের সঙ্গে একটা কথা বলতে দেরী হয়ে গেল।

সুরেশের প্রতি ব্যবহারে ব্রজবিহারীবাবুর বেশ একটু তারতম্য ঘটেছে, আজকাল তাকে ভয়মিশ্রিত সম্মানের চোখেই দেখেন। এমন কি পাছে সুরেশ অসন্তুষ্ট হয় সেই ভয়ে মালতীর বিয়ের ব্যাপারেও তাকে বেশি চাপাচাপি করতে ভরসা পান না। আজ সাহস করে বলে ফেললেন, সুরেশ এরপর তোমাদের বিয়ের একটা দিন ঠিক করে নাও, অনেকদিন হয়ে গেল তুমি এবাড়িতে মেলামেশা করছো, লোকের চোখে সেটা খারাপ ঠেকছে, এমন কি মিত্তির বাড়ির ছোট কর্তা তো একরকম শাসিয়েই গেলেন সেদিন, বললেন মেয়ের বিয়ে দাও নয় তো বাড়ি ছেড়ে দাও।

সুরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমার বিয়েতে কোন আপত্তি নেই তবে কি জানেন এই অঘ্রাণে মা আসবেন কলকাতায়, আমার ইচ্ছে সেই মাসেই.....চুপ করলো সে। ব্রজবিহারীবাবু পেরেকে টাঙ্গানো ময়লা জামাটা গলায় গলিয়ে দরজার গোড়ায় যেতে যেতে বললেন, তবে সেই ভাল তোমার যখন ইচ্ছা। বস তুমি আমি কাজটা সেরে আসি।

ব্রজবিহারীবাবু বেরিয়ে যেতেই সুরেশ ভেতর দিকে গেল। সবেমাত্র খাওয়া সেরে মালতী এসে বসেছে রান্নাঘরের পাশে একফালি

চতুর্থ সর্গ

যেতে পারো যা খুশি।—অমিতাভর পিঠে একটা মৃদু-চাপড় মেরে দারোগা এগিয়ে গেলেন যামনে।

আমাদের জেলে নিয়ে যাবেন না?

জেলে অত লোক ধরবে কেন?· যেতে যেতে পেছন ফিরে বললেন দারোগা।

সেই থেকে অমিতাভ সাবধান হয়ে গেছে; এখন গ্রেপ্তার করছি বললেই সে আর উঠে দাঁড়াবার আদেশ দেয় না।

আজ আবার এক নূতন সমস্যায় পড়েছে: ওপর থেকে আদেশ এসেছে এরপর থেকে সত্যাগ্রহীরা কোন রকম গ্রামের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে না।

হাতের আদেশপত্রটার লালকালির দাগ দেওয়া জায়গাটা সে নিম্নস্বরে আর একবার পড়লে, গ্রাম্য চাষীদের সঙ্গে যেন কোন সহযোগ না থাকে; অহিংস সংগ্রামের মূল আদর্শচ্যুতির আশঙ্কায় এই রকম নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আদেশটা পড়ার পর থেকেই নানা কথা জটপাকিয়ে এলো অমিতাভর মাথায়। সে সেটা সবাইকে পড়ে শুনিয়ে দিলে। ক্ষুণ্ণমনে সবাই চাইল অমিতাভর দিকে, সে বললে, বিচারের প্রয়োজন নেই, পালন করতে হবে।

খাবার সময় সবাই এক একবার সোনাদির মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাইল। কাল তারা চলে যাবে শুনে সোনাদির মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছে। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু একবারের জন্যেও কেউ দেখতে পেলে না। খাওয়া শেষে সোনাদি বলে উঠলেন, এ অন্যায়। আমাদের কি সাধ যায় না দেশের কাজ করতে।

অমিতাভ একবার তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নিচু করলো; কি যেন সে দেখতে পেলে ওই মুখে। মনে মনে বললে, ধন্য মেদিনীপুর। তোমার মাতৃত্ব সার্থক।

নিঃশব্দে উঠে পড়লো ছেলের দল। সোনাদি তাদের কাছে এগিয়ে

এসে বললেন, আমাদের মনে রেখো ভাই, আমরা বড় গরীব বড় দুঃখী ; ছেলেদের চোখে জল ভরে এলো ; এ যেন তাদের অতি প্রিয়জনের কাছে বিদায় নেবার বিষাদমুহূর্ত। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

নিজেকে সংযত করে বললে অমিতাভ, সোনাদি এর মধ্যেই বিদায় দিচ্ছেন কেন ? আমরা গ্রামের ধারেই তো থাকবো ?

গ্রামের মধ্যে থাকা আর ধারে থাকা এক নয় ভাই। একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো সোনাদির ঠোঁটে।

মানিক এসে বললে, মা, বাবা এদের একবার দেখতে চান।

অমিতাভ চমকে উঠলো, তাইতো এ বাড়িতে এতদিন বাস করলো অথচ গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করেনি। সে অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি বললে, সোনাদি চলুন আমাদেরও দেখা করতে হবে।

উঠোন পেরিয়ে চললো সবাই। ছেলেদের মনে অদ্ভুত কৌতূহল, সোনাদির স্বামী।

গৃহস্বামীর ঘরের দেওয়ালে সাদা খড়ির নিপুণ আলপনা আঁকা, একপাশে একটি ফাঁকা খাটিয়া, অন্যদিকে একটা খাটিয়ায় শায়িত নরদেহ। রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে যে কোন বয়স ঠিক করা যায়। মুদিতচক্ষু, অবশ শরীর শিথিলভাবে পড়ে আছে খাটিয়ায়

সোনাদি তাঁর কাছে গিয়ে উঁচু গলায় বললেন, ছেলেরা তোমাকে দেখতে এসেছে। ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালেন তিনি ছেলেদের দিকে ; জীবনে এমন নির্জীব শূন্যদৃষ্টি অমিতাভ দেখেনি। অনেক কষ্টে হাতটা কাঁপাতে কাঁপাতে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

সোনাদি বললেন, উনি তোমাদের বসতে বলছেন।

অমিতাভ দেখলে, তাঁর গালের কুঞ্চনগুলো অক্ষম চেষ্টায় বার বার দুলে উঠছে। সে একবার সোনাদি একবার তাঁর মুখের দিকে চাইল। মন তার কোথায় যেন চলেছে। এই তো সমাজের

সত্য রূপ, একদিকে সোনাদি অন্যদিকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু তাঁর স্বামী। সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

আপনভোলা মহেশ, পাত্র হাতে এসে দাঁড়ালো অন্নপূর্ণার দ্বারে, সেখানে দেখলে অন্নপূর্ণার মূর্তি গেছে বদলে, সৃষ্টিময়ী শক্তির পা জড়িয়ে যাচ্ছে স্থবির মহাকালের দেহে। না না এ হতে পারে না, সোনাদির স্বামী এ নয়—ছটফট করে উঠে পড়লো অমিতাভ, সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল।

দরজার চৌকাট ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সোনাদি তাদের গতিপথের দিকে।

কি যে করি জ্যাঠামশায় ? চাকরীর সন্ধানে কদিন ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু কোনো আশা দেখছি না।—আপনি যদি একটা কিছু...

আমি আর কি-বা করতে পারি ?—একটু থেমে আবার শুরু করলেন—তবে আমার মনে হয় তুমি সাধারণ লাইনে না গিয়ে ছবি আঁকার লাইনে গেলে ভাল হয়।

ক্ষণেকের জন্যে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ললিতের, সে বললে, ছবি আঁকায় কি পয়সা রোজগার হবে ?

তা হবে না বটে, তবে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডিজাইন, সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ করো তা হলে চর্চাও থাকবে আর পয়সাও কিছু কিছু পাবে।

কথাটা ললিতের মন্দ লাগলো না সে তাড়াতাড়ি বললে, জ্যাঠা-মশায় আপনার জানাশোনা কোন লোক আছেন কি যিনি আমাকে এই সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করতে পারেন ?

একজন লোককে আমি জানি সে যদি তোমাকে তার এ্যাসিস্টেণ্ট করে নেয় তা হলে ও কাজের হদিশ বুঝতে পারবে, আমি তাকে কাল একবার বলে দেখবো।

আনন্দে নেচে উঠলো ললিতের মনটা, ভরসা হলো, উনি কাউকে বললে সে না করতে পারবে না।

আপনার একটা ছবি এ কে দেবো জ্যাঠামশায় ? আমি কি রকম আঁকতে পারি বুঝতে পারবেন।

দুর পাগল ! আমার ছবি আঁকতে হবে না।

রামকালীবাবুর গুরুগম্ভর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো।

বায়নার সুর ধরে বললে ললিত, বেশি দেরী হবে না জ্যাঠামশায়, পেন্‌সিলে আঁকবো, আপনার স্নানের সময়েব আগেই শেষ করে দেব।

॥ ৩ ॥

লালকাঁকড়ের বাঁধ দেওয়া বিঘে দুয়েক পুকুর। পাড়ের ওপার গোটা কতক বট, অশ্বত্থগাছের নমুনা দেখে মনে হয় বাঁধটার বয়স হয়েছে; বহুদিনের পোক্তা বাঁধন আজও কোথাও চিড় ধরেনি, এই বাঁধের দৌলতে সম্মুখের ঢালুটার যত জল এসে জমা হয় এই পুকুরে। জলটায় গেরুয়া রং হলেও সাঁতার-জল থাকে গ্রীষ্মকালে। উত্তরে আমকাঁঠালের বাগান, দু-একটা লিচুর গাছও খুঁজে বার করা যায়। বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণ ঘেঁষে সোনাদির গ্রাম।

সত্যাগ্রহীরা এই পুকুরপাড়টাই তাদের বাসের জন্যে বাছাই করেছে।

রোজ সকালে স্নান করে নদীর ধারে, ফিরে এসে রান্না করে আম-বাগানে। দৈনিক পিছাবনী শিবিরের বরাদ্দ নিয়ে আসে একটি স্বেচ্ছাসেবক, কোনদিন চাল ডাল, কোনদিন চাল আলু, আবার কোন দিন শুধু চাল। রান্নার সময় লাগে কম; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে অমিতাভরা পায় অফুরন্ত অবসর।

অন্ধকার হলেই চাটাই পেতে ঘুমের ব্যবস্থা করে, প্রথম দিকটা ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, তারপর গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়: চারিদিকের নিস্তব্ধ নিঝুম নিরালার মধ্যে তারাভরা আকাশটাকেই নিকটতম মনে হয়। দক্ষিণের আদিগন্ত-বিসর্পিত প্রান্তরের অপর প্রান্ত থেকে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ার চাপে শরীরগুলো যখন কন্‌কনিয়ে ওঠে তখন উঠে গিয়ে কোন গাছের আড়ালে বসে বলে, পুলিশকে পারা যায়, কিন্তু এই হাওয়ার জ্বালাতেই পালাতে হবে দেখছি। অফুরন্ত বাতাসের ঢেউগুলো যেন একবার থামলে বাঁচে তারা।

পুলিশের দল এখনও এই ডেরার সন্ধান পায়নি। নদীর ধারে দেখলেই বলে,—শালারা থাকেই বা কোথায়, খায়ই বা কি?—গ্রামের

লোকদের ওপর শাসানি চলে, সন্ধানের আশায় কাউকে বেঁধে মারে কাউকে পয়সার লোভ দেখায়।

বেতে যখন বশ হলো না, তখন অন্য পন্থা ধরলেন দারোগারা। থাকা খাওয়ার আস্তানাগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে বিদেশী ছেলেগুলো পালাতে পথ পাবে না তাই ইদানিং ডেরার সন্ধানে শিকারী কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ধার নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

অমিতাভদের এ আস্তানা পুলিশের ধারণা বহির্ভূত, আজগুবী ব্যাপার। কাজেই এখানে নির্বিবাদে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।

সকালবেলা নুন করা সেরে গোপন পথে ঘুরে ঘুরে তারা এসে পৌঁছলো আমবাগানে। সকালের চিড়েগুলো পেটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে। সবাই মিলে পুকুরের আঁজলা-কতক জল খেয়ে পেটের চুপসেযাওয়া চামড়াগুলো একটু উঁচু করে নিয়ে বসলো গাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে।

সুনির্মলের রান্না করার পালা আজ, সে না বসেই ভাত সেদ্ধ করার ব্যবস্থায় মন দিলে। অমিতাভ হেসে বললে, দেখ ভাই আজও পুড়িয়ে ফেলো না ভাতটা—চিড়েও নেই—আজ তা হলে স্রেফ্ হরিমটর।

রোদে তামাটে হওয়া সুনির্মলের মুখটা আরো যেন লালচে হয়ে এলো, সে তাড়াতাড়ি বললে, না না আজ পুড়বে না। আতপ চাল যে অত চট করে সেদ্ধ হয় সেদিন জানতুম না।

তা হলে একটা শিক্ষা হলো কি বলো?

সুনির্মলকে চোখের একটা ইসারা করে বিভূতি বললে, আর একটা শিক্ষা হয়েছে। বলবো নাকি হে?

তার দিকে চেয়ে ঘোর আপত্তি জানালো।

অমিতাভ বললে বিভূতির দিকে চেয়ে, বল হে বল, সত্যাগ্রহীদের কিছু গোপন করতে নেই।

॥ ৪ ॥

অপরাহ্ণে অন্যদিনের মত আজও এলো পিছাবনী শিবিরের সংযোগ-রক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবক, বরাদ্দ চাল ডালের কোন চিহ্ন নেই তার সঙ্গে। সে শুষ্ক মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, খবর খুব খারাপ, পিছাবনী শিবির পুলিশে দখল করেছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে অমিতাভ, ঈশ্বরদা কোথায় ?

ঈশ্বরদা এবং অন্য সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

এখন উপায় ?

ঈশ্বরদা আদেশ দিয়ে গেছেন, এখন থেকে সমস্ত কেন্দ্রে স্থানীয় নেতারা তাদের এলাকায় অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে নেবে। সত্যাগ্রহীদের মুখগুলো শুকিয়ে এলো।

অমিতাভ বললে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি করে করবো।

স্বেচ্ছাসেবকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এখন আসি ভাই—আর হয়তো দেখা হবে না, আমাকে এখনও আরো দুতিন জায়গায় খবর দিতে হবে ; হাওয়ার বেগে বেরিয়ে গেল সে সাইকেলে চেপে ; অমিতাভ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলো।

অন্ধকার ঘন হয়ে গেল। অমিতাভর কাছে একমাত্র পথ খোলা—গ্রামের সাহায্য কিন্তু গ্রামবাসীর বিপদের কথা ভেবে সে সাহস পাচ্ছে না। এ ছাড়া উপায় কি ? হয় সংগ্রাম বন্ধ করে ফিরে যেতে হবে, নয় গ্রামবাসীর সাহায্য নিতে হবে।

অন্ধকারে মানিক এসে দাঁড়ালো সামনে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ, কি খবর মানিক, এ সময় ?

পুরোদস্তুর মুরুব্বির মত বললে, আজকার ব্যাপার শুনে সবাই ঠিক করেছেন, আপনাদের গ্রামেই খেতে হবে।

॥ ৫ ॥

ঘরের এককোণে মাদুরে বসে মালতী ললিতের একটা সার্ট সেলাই করছে। দ্বিপ্রহরে সে পায় একটানা অবসর।

ব্রজবিহারীবাবু দালালীর কাজে বেলা এগারোটার আগেই বেরিয়ে গেছেন, ললিতও বেরিয়েছে তার নতুন চাকরীতে। ফিরবেন সব অন্ধকার হবার পর।

সুরেশকে দিয়ে লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে নিয়েছে মালতী, এই দীর্ঘ একঘেঁয়ে দিনগুলো কাটাবার তাই একমাত্র ভরসা।

সেলাইটা শেষ করে ভাবতে লাগলো মালতী : নিজের কথা, সুরেশের কথা, আরো কত কথা।

সুরেশ আজকাল আসে কম, কি রকম যেন মনমরা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে ওঠে, হাজার হোক পুরুষ মানুষ, ওদের ভালবাসা ধৈর্য মানে না, কিন্তু কি করবে সে? তারই কি ভাল লাগে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সুরেশকে ভালবাসে, তাকে নিবিড় ভাবে পেতে চায়, এটা কি সে বোঝে না, তবে কেন তার এই অভিমান, এই এড়িয়ে চলা? নিলেই তো পারে সুরেশ তাকে আপনার করে, মাকে দুদিন আগে আনা যায় না? তার যে আর ভাল লাগছে না এই একঘেঁয়েমি। মনে পড়ে যায় মায়ের মৃত্যুর সময়টা। মুহূর্তের জন্যে সে যেন অতি আপনার করে পেয়েছিল সুরেশকে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, সুরেশ খালি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে—আর একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা হলে তবে বিবাহিত জীবন সুখের হবে। এ কথার মানে মালতী বুঝতে পারে না, তার দাবী তো বেশি নয়, সামান্য খাওয়া পরা আর শান্তি, এই তো। ঐশ্বর্য, নাই বা হলো।

ওই যে কর্তাদের ছোঁড়াটা—অমি, অমি—আমাকে কি না পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে মদ খেতে পাবেন না—হুঃ মদ খাব না তো খাব কি বাবা, আছে কি দুনিয়ায়। বোকার মত হেসে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু।

ললিত কোন কথা না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মালতী একপাশে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে।

॥ ৬ ॥

দিনের পর দিন অমিতাভদের হুন্ করা চলেছে। হুন করাটা এখন অতিরিক্ত, পুলিশকে কর্মক্লান্ত করাই সংগ্রামের আসল রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানিকের কোকিলের দল গাছে গাছে বসে তাদের নানা কাজে সাহায্য করে; তাদের চাতুরী—সুচতুর পুলিশদলকেও হার মানিয়েছে। এই কেন্দ্রে এখন মাত্র তিনজন আছে, অমিতাভ, সুনির্মল, বিভূতি। পুলিশের দলকে নদীর পাড়ে দেখে অমিতাভ আদেশ দিলে ঠিক হয়ে বসতে। হুন করার ভঙ্গীতে সবাই বসে পড়লো।

দারোগা তাদের কাছে এসে দারুণ বিরক্তিতে বললেন, না এই তিনটেকে পারা গেল না। কাঁথি না পাঠিয়ে উপায় নেই—এই ছোঁড়ারা চল্ তোদের গ্রেপ্তার করলুম।

চলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং যেন বেশি করে চেপে বসলো তিনজনেই।

গলাটা চড়িয়ে বললেন দারোগা, শালারা কি এমনি যাবে কাঁধে চেপে যাবার মতলব—আচ্ছা ফন্দী বার করেছে আজকাল। পুলিশদের আদেশ করলেন, তিনটেকে কাঁধে ওঠাও—গাঁয়ে গরুর গাড়ী ভাড়া করে কাঁথি জেলে চালান দিতে হবে।

দুজন করে পুলিশ এক একজন সত্যাগ্রহীকে মড়া ঝোলানো করে নিয়ে চললো দারোগার পেছনে। চাপা হাসিতে পেটে খিল ধরবার জোগাড় হয়েছে সুনির্মলের; সেটা ভোলার জন্যে সে চিৎকার করে উঠলো বন্দেমাতরম্। সবাই তাতে যোগ দিলে, দারোগা ভ্রুকুটি করে ফিরে তাকিয়ে আবার এগিয়ে চললো।

গ্রামে গরুর গাড়ীতে চাপবার সময় অমিতাভ দেখতে পেলে রাস্তায়

॥ ৭ ॥

কাঁথি জেলে এসে অনেক দিন পর আরামে দিবানিদ্রা দিচ্ছে অমিতাভ। সুধীরের ঠেলাঠেলি আর বন্দেমাতরম্ চিৎকারে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলতেই সুধীর বললে, উঠে পড়ো। হাঁদা এসেছে। কথাটা বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইল অমিতাভ।

এখানের পুলিশের বড়কর্তা, জেল পরিদর্শনে এসেছেন। অদ্ভুত লোক, হাসতে হাসতে লাথি চালান সত্যাগ্রহীদের ওপর, যেন ফুটবলে পেনালটি কিক্ করছেন।

বাইরে বেরিয়ে দেখলে সার দিয়ে সত্যাগ্রহীরা দাঁড়িয়ে এবং একজন সায়েবি পোশাকপরা লোক সদর্পে পায়চারী করছেন। ছোট্ট মেয়েলি ছাঁদের চেহারা, মুখে সুকুমার লালিত্য, রং ধবধবে, কোঁকড়া চুলগুলো ব্যাক্‌ব্রাশ করা।

সুন্দর কান্তি এই লোকটি হুদা সাহেব। যাঁর নির্দেশে চলেছে কাঁথির যা কিছু।

অমিতাভ যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। ফিরে ফিরে তাকালো তাঁর দিকে।

মুচকি হেসে সুধীরের মুখের দিকে দেখছেন হুদা; সেও চেয়ে আছে সোজা।

কোথায় বাড়ি হে? প্রশ্ন করলেন পুলিশকর্তা।

ঢাকা। উত্তর দিলে সুধীর।

চোখ দেখে টেররিস্ট মনে হচ্ছে, কি হে টেররিস্ট নাকি?

অহিংস সৈনিক, সত্যাগ্রহী।

ওটা ভাঁওতা। জোরে হেসে উঠলেন পুলিশ কর্তা। ঢাকায় আমারও বাড়ি, চিনে রাখছ নাকি?

কত লোককে চিনবো ? সুধীর বললে।

একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন পুলিশকর্তা, তা হলে টেররিস্ট এটা স্বীকার করছো ?

না, সত্যাগ্রহী—উত্তর এলো।

একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন হুদাসাহেব, ও সব চালাকি আমরা বুঝি।

সুধীর চুপ করে গেল, হুদা সাহেব এগিয়ে গেলেন অন্য ছেলের সামনে।

অমিতাভ ভাবলে, ফন্দী মন্দ নয়, সত্যাগ্রহীকে টেররিস্ট আখ্যা দিয়ে প্রভুর স্বরই বিবর্ধিত করছে।

হুদাসাহেব পরিদর্শন শেষ করে কম বয়সের সত্যাগ্রহীদের জেলের বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে পুলিশকে আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

অমিতাভ সুনির্মল ইত্যাদি জনদশেক সত্যাগ্রহীকে পুলিশদল টেনে বার করলে লাইন থেকে। তারা লাইনের বাইরে এসে বসে পড়লো মাটিতে।

পুলিশদল যত তাদের তোলার চেষ্টা করে ছেলেরা তত গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। অগত্যা দুজন করে পুলিশ এক একজন সত্যাগ্রহীকে ঝুলিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ানো মোটরবাসে ভরাবস্তার মত ছুঁড়তে লাগলো ; তারা পড়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলো বন্দেমাতরম্।

দশজন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে বাস ছুটলো কণ্টাই রোড স্টেশনে।

স্টেশনে লাল কাঁকরের ওপর লম্বা হয়ে শুলো সত্যাগ্রহীদল। একজন পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করলে অমিতাভকে, বাড়ি কোথায় বাবু ?

মেদিনীপুর। উত্তর বেরিয়ে গেল অমিতাভর। অন্য সবাইকে জিজ্ঞেস করতে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, মেদিনীপুর জেল।

তার ডাকটা যেন করুণ কান্নার মত শোনাচ্ছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দুটো মুখে, একটা মুখ নিজ.ব ফ্যাকাসে, আর একটা মুখে শঙ্কিত ব্যাকুলতা, চোখের কোণে মুক্তার মত দুফোঁটা জল টলটল করছে।

একজন ছেলে শিবকালীবাবুর দিকে চেয়ে বললে, আমরা নিজেদের জন্যে ভাবি না, অমিতাভকে নিয়ে যাবো কোথায় ঠিক করতে পারছি না।

ওকে তোমরা আমার গাড়ীতে তুলে দাও, আর তোমাদের একটা ঠিকানা লিখে দিচ্ছি সেখানে গেলে মেদিনীপুর কংগ্রেস· থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে, টাকা পয়সা কিছুই তো নেই তোমাদের কাছে, কলকাতায় ফিরতে হলেও তো তোমাদের এখন ফেরা সম্ভব নয়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেলের দল গিয়ে দাঁড়ালো অমিতাভর কাছে, অচৈতন্য অমিতাভর কপালে গালে হাত বুলিয়ে তারা বিদায় নিলে; ধীরে ধীরে তুলে দিলে তাকে পেছনের সিটে।

কার্ডের ওপর একটা ঠিকানা লিখে শিবকালীবাবু ছেলেদের হাতে দিলেন।

মোটরটা স্টার্ট দেবার সময় নেচে উঠলো; ছেলেরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলো মোটরের গতিপথের দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ এই যে নিয়ে আসি, বেরিয়ে গেল রুনু ঘর থেকে।

দুধ এনে আস্তে আস্তে ডাকলে রুনু, একটু দুধ খেয়ে নাও মিনটুদা।

চোখ না খুলেই অমিতাভ হাঁ করলে; রুনু তাকে দুধ খাইয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দিলে মুখটা; তারপর বসলো মাথার কাছে।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রুনুও যখন ঘুমে ঢলে পড়লো পুবের আকাশে তখন রংয়ের খেলা শুরু হয়েছে।

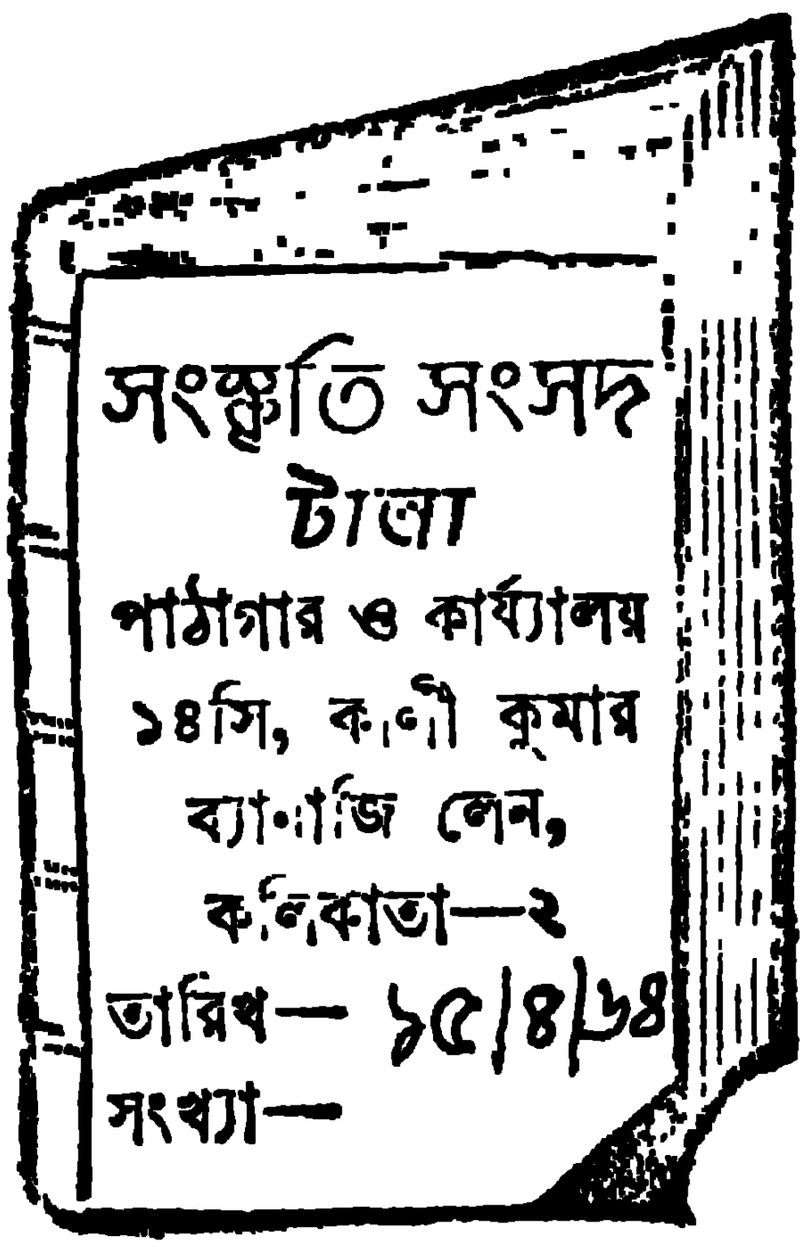

॥ ৯ ॥

সম্পূর্ণ অসংযত অবস্থায় বসে ব্রজবিহারীবাবু। ঘরে এসে ঢুকলো সুরেশ। তাকে দেখে জড়িতকণ্ঠে বললেন, এই যে সুরেশ, তোমার যে পাত্তাই মেলে না আজকাল!

নানা কাজের ভিড়ে এদিকে আসতে পারিনি, তাচ্ছিল্যের সুরে বললে সুরেশ। তার কাছে উঠে গিয়ে একটু হেসে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, দাও দিকি গোটা কতক টাকা।

সুরেশ খুশিমনে পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট তাঁর হাতে গুঁজে দিলে। ব্রজবিহারীবাবু বললেন তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে, তুমি বেশ লোক মাইরি! আমি বেরোব। জামা না পরেই ব্রজবিহারীবাবু বেরিয়ে গেলেন; সুরেশ ভেতরে গেল।

মালতী একমনে বই পড়ছে, সুরেশ পা টিপে গিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরলে। হেসে বললে মালতী, যাও তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ।

তার গা ঘেঁসে বসে পড়ে বললে সুরেশ, তুমি তো চাও না আমার আসা।

কৌতুকভরা চোখে তাকাল মালতী তার দিকে, দেখলে সুরেশ চেয়ে আছে, তার বুকের খসে যাওয়া কাপড়টার ফাঁকে।

সঙ্কুচিত হয়ে সে কাপড়টা ঠিক করে নিলে।

মালতীকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বললে সুরেশ, এখনও আমার কাছে এত লজ্জা কেন মালতী?

তার কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে মালতী চুপ করে রইল।

দু হাতে তার মুখখানা তুলে ধরে বললে সুরেশ, তোমায় আজ উত্তর দিতেই হবে মালতী!

॥ ১০ ॥

রুনুর সেবায় ও শিবকালীবাবুর ঐকান্তিক সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই অমিতাভ পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পেল।

প্রথম প্রথম তার দারুণ সংকোচ লাগতো এখানে কিন্তু সে যখন আবিষ্কার করলে, শুধু পূর্ব পরিচিত হিসাবেই নয়, শিবকালী বাবু তাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখেই দেখেন তখন তার সংকোচ কেটে গেল অনেকটা।

গান্ধীজি ও খদ্দরের ওপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা অমিতাভ লক্ষ্য করেছে; এমন কি বে-আইনী কংগ্রেসের সঙ্গে তার সংযোগ আছে মনে হয়; রুনু তো প্রকাশ্যেই শহরের চরকা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এতটা অমিতাভ কোন দিনই আশা করেনি। তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শিবকালীবাবু পঞ্চমুখ; প্রশংসার ঠেলায় মাঝে মাঝে অমিতাভ নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, শিবকালীবাবুর বন্ধুদের কাছে কাঁথির গল্প বলতে বলতে সে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে।

একটা আরাম চেয়ারে বসে অমিতাভ, বাগানে ঝাপালো ঝাউ গাছটার দিকে চেয়ে নানা কথা ভাবছে। রুনু এসে জিজ্ঞেস করলে, চা দেবো মিনটুদা? কি ভাবছো?

অমিতাভ চাইলে রুনুর দিকে: একটা নিশ্বাস নিয়ে বললে, ভাবছি এইবার কবে বিদায় নেব।

রুনুর হাসিভরা মুখখানা কাল হয়ে এলো, অভিমানের সুরে বললে, এখুনি ও কথাটা নাই-বা ভাবলে!

স্বপ্নালু চোখে সে চাইল রুনুর দিকে: কি যেন নতুন জিনিস দেখতে পেলে তার সাদা থানে ঢাকা মূর্তিটার মধ্যে। ছোটবেলায়

যাকে মেরে কাঁদানো যেত না, সে আজ সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। অনির্বচনীয় আকর্ষণে অমিতাভর মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠলো, সে রুনুর একটা হাত টেনে নিয়ে বসালে পাশের চেয়ারে, মৃদুভাবে বললে, রুনু মনে পড়ে আমাদের সেই দিনগুলো ?

পড়ে মিনটুদা—জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলে রুনু।

আবার কি ফিরিয়ে আনা যায় না সেই দিনগুলো ?

খুশিতে ভরে উঠলো রুনুর মন, সে মাথাটা ঘুরিয়ে বললে, কি জানি।

অমিতাভর মনের কোণে তুফান এলো। স্বপ্নজড়িত কণ্ঠে সে বললে, জান রুনু এটা কার দেশ ?

বিস্মিত রুনুর চোখ তার ওপর সোজা এসে পড়লো, সে বললে জোর দিয়ে বিদ্যাসাগরের। প্রশ্নের আসল অর্থ বুঝে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো রুনু, তার গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

চমকে উঠলো অমিতাভ, সে বুঝি এই কথায় রুনুর মনে ব্যথা দিয়েছে। অনুশোচনার সুরে বললে সে, আমায় ক্ষমা করো রুনু —আমায় ক্ষমা করো।

ক্ষীণ হেসে রুনু তার হাতদুটো ধরে বললে, পাগলের মত কি বোকছো। চলো তোমাকে চরকা কাটতে শিখিয়ে দি।

লজ্জিত অমিতাভ তার পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকলো অন্য ঘরে। মেজেতে অনেকগুলো চরকা সাজানো, একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে রুনু, ওইটেতে তুমি বসো, সহজে শিখতে পারবে।

অমিতাভ মাথা নিচু করে গিয়ে বসলো চরকার সামনে ; একটা লম্বা তুলোর পাঁজ তার হাতে ধরিয়ে বললে রুনু, এই রকম ভাবে ধরো—তারপর ডান হাতে চাকা ঘোরাও বাঁ হাতে পাঁজ টেনে যাও। যন্ত্রচালিতের মত সে রুনুর কথা অনুযায়ী চেষ্টা করতে লাগলো ; দুটো হাত কিছুতেই সমানে চালাতে পারছে না ; একটা হাত

রামকালীবাবু যেন মহাসমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন; তার স্ফীত উত্তাল তরঙ্গ কে রোধ করবে—কে রোধ করবে এই অনিবার্য তরঙ্গের রুদ্রগতি।

বিরক্ত কুঞ্চিত মুখে ঘরে ঢুকলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। চিন্তাকুল রামকালীবাবুর পাশে বসে ডাকলেন, দাদা।

কি? বললেন রামকালীবাবু তাঁর দিকে চেয়ে।

ওই ছোঁড়াটা সত্যিই সুরেশ ডাক্তারকে খুন করেছে।

কি করে জানলে?

ওই যে পুলিশ এসেছে তার খোঁজ করতে।

পুলিশ এসেছে।—চমকে উঠে পড়লেন তিনি—এ আমি বিশ্বাস করি না, এ হতে পারে না চলো আমার সঙ্গে পুলিশের কাছে, ললিত খুন করতে পারে না।

ললিতদের দরজায় দাঁড়ানো দারোগাকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন রামকালীবাবু উত্তজিত কণ্ঠে, কি ব্যাপার, কিসের জন্যে এসেছেন এখানে?

তিনদিন পুর্বে এক ডাক্তার খুন হয়েছে, ললিত নামে এই বাড়ির একটি ছেলেকে দেখা গেছলো খুনের পরেই, তার ডিসপেনসারির থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে, সন্দেহ আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে সে সেইদিন থেকে ফেরার হওয়ায়—বললে দারোগা।

মিথ্যা। এ আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস আপনি না করুন, আদালত বিশ্বাস করবে।

খানাতল্লাসী শেষ করে পুলিশদল ফিরে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না ভেসে এলো রামকালাবাবুর কানে, তিনি ভেতরে গেলেন।

বালিশে মুখগুঁজে মালতী কাঁদছে দেখে সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, মালতী মা কি হয়েছে আমায় সত্যি বলো।

শিবকালীবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারক বললেন, আপনি সম্ভ্রান্ত লোক, আপনি নিজে দায়িত্ব নিলে আমি আপনাদের খালাস দিতে পারি।

স্মিত হাসি ফুটে উঠলো শিবকালীবাবুর মুখে, শান্ত স্বরে তিনি বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আমার নেই, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করুন।

বিচারক লিখে গেলেন তাঁর রায়। আদলত কক্ষে তখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে দরদী জনতা।

গম্ভীরভাবে বিচারক রায় পড়তে আরম্ভ করলেন, বাদী ভারতেশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলের কানে গেল শুধু কটি কথা, অমিতাভ রায় সাজা এক বৎসর, সুমিত্রা দেবী সাজা ছয় মাস, শিবকালী মিত্র সাজা ছয় মাস। পুলিশের আদেশে তিনজনে বেরিয়ে এলো কোর্ট প্রাঙ্গনে; শতকণ্ঠে চিৎকার উঠলো, বন্দেমাতরম্। বারান্দায় দাঁড়িয়ে খান সাহেব নামে পরিচিত শাসনকর্তা, ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন জনতার দিকে।

শিবকালীবাবু, রুনু, অমিতাভ গাড়ী থেকে নামলো মেদিনীপুর জেলগেটের একটু দুরে। পুলিশে ঘেরাও করে নিয়ে চললো তাদের : সামনে শিবকালীবাবু, পাশাপাশি অমিতাভ, রুনু; যেতে, যেতে অকারণে কাঁধে কাঁধে ঠেকে যাচ্ছে; খুশির বান আসছে তাদের মনে, মুচকি হেসে পরস্পরের দিকে চাইছে।

এ যেন তাদের চিরদিনের যাত্রাপথ, এ পথ যেন শেষ না হয়; বাধার ওই প্রকাণ্ড লৌহদ্বার, ওটা তো পথরোধ করতে পারে না, ওটা অচলায়তনের দারিদ্র্যে পঙ্গু, গতির ঐশ্বর্যে তারা অপরাজেয়।

পঞ্চম সর্গ

মুখখানা কাল হয়ে উঠলো ; তার মনে হলো কোণে বসা হিন্দুস্থানীটি তাকে লক্ষ্য করছে—একটা হিমরেখা ব'য়ে গেল মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, চট করে মাথাটা ঘুরিয়ে নিলে জানালার দিকে।

স্টেশনের কোলাহলে ললিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল ; জানালায় মাথা রেখে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুঃস্বপ্নের মত রাত্রি কোথায় মিলিয়ে গেছে ; সেডের ফাঁকে একফালি রোদ এসে পড়েছে কামরার মধ্যে। ললিতের মনে হলো পেছনে-ফেলে-আসা সব কিছু মিথ্যা ; আশায় ভরে উঠলো বুকটা-- -সে ভাল করে চাইলে চারিদিকে : নানা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, যুক্তপ্রদেশের মুসলিম সভ্যতার ছাপ তাদের চাল চলনে পোশাকে পরিচ্ছদে ; চেহারার মধ্যে বৈদেশিক নুতনত্ব। ললিত ভাবলে, এখানে তার অতীত ভোলা সোজা হবে, নুতন করে গড়ে তুলবে জীবনের পরিখা ; ফাঁসির দড়িতে মরতে পারবে না। এখানেই তাকে গাড়ী বদল করতে হবে আগ্রার পথে, সুটকেশটা হাতে নিয়ে সে নেমে পড়লো।

আগ্রা লাইনের গাড়ীতে এসে যখন সে উঠলো, বেলা তখন বেশ বেড়ে গেছে ; ফাঁকা কামরার মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে পা ছড়িয়ে বসলো, ট্রেনটা ছেড়ে দিল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। মন্থর গতিতে চললো দুপাশের গমের ক্ষেত চিরে।

ছোট ছোট পল্লী স্টেশনে যাত্রীদলকে স্নেহময়ী মাতার মত কোলে তুলে নিয়ে ট্রেনখানা এসে পৌঁছুলো আগ্রার কাছাকাছি : দূরে যমুনার তীরে যেন নীল আকাশের গায়ে তুষারশুভ্র মেঘে আঁকা মর্মর স্বপ্ন, বিস্ফারিত চোখে চাইল ললিত—তাজমহল, তাজমহল।

আগ্রার ফোর্ট স্টেশনের সুড়ঙ্গে এসে ট্রেন থামলো। বুকটা যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে মুখে প্রফুল্লতা টেনে এনে ললিত নেমে পড়লো প্লাটফর্মে, তারপর সোজা চললো বেরোবার গেটের দিকে।

অপরিচয়ের সংকোচ কাটিয়ে চারিদিকে চাইতে চেষ্টা করলো

টাঙ্গাটা একটা ছোট্ট গলির মুখে ঘুরে গেল, দু ধারের চাকা বুঝি লেগে যাবে দুদিকের দেওয়ালে।

টাঙ্গাওয়ালা দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে থামলো একটা পাথরের বাড়ির সামনে।

উর্দু ও ইংরাজিতে লেখা হিন্দু হোটেলের সাইন বোর্ড দেখে ললিত সুটকেশ হাতে নেমে পড়লো।

টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে চারিদিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে পাথরের দরজা দিয়ে গলে গেল সে ভেতরে।

গোরা সৈন্যরা যারা এখানে থাকে তারাও ওদিকে যেতে সাহস করে না।

একটু হেসে চুপ করে গেল ললিত। গাইড ক্ষুণ্ণ মনে অমর সিংহের গেটের দিকে বড় বড় পা ফেলে চললো।

আরো জনকতক নরনারী দুর্গ দেখবার জন্যে এসেছে; তাদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী পরিবারও রয়েছে। বাঙ্গালীর মুখ দেখলেই ললিতের সব মনে পড়ে, আশঙ্কায় তালু শুকিয়ে আসে। সবাইকে পাশ কাটিয়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল; স্যাৎসেতে অন্ধকার রাস্তার দু-পাশে পাষাণ কক্ষ থেকে কেমন যেন একটা পরিচিত গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে, মনে পড়লো, মিত্তির বাড়ির সদর দরজার দুপাশের রোয়াক: দিদির কাতর চিৎকার: ওটা লম্পট! ওটা লম্পট! তারপর জনবহুল রাস্তা, সুরেশ ডাক্তারের ডিসপেনসারি, উন্মত্তভাবে সুরেশকে আক্রমণ, সুরেশের অসাড় দেহ মেজেতে লুটিয়ে পড়া।

ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো ললিতের। গাইড ছোকরা একটু হেসে বললে, এই সামান্য সিঁড়ি উঠতেই হাঁপাচ্ছেন বাবুজী, এখনও যে অনেক বাকী।

উদ্‌গত নিঃশ্বাসটা চেপে চাইল সে গাইডের দিকে।

জাহাঙ্গীর মহলে যাবেন? বললে গাইড।

চলো।

জাহাঙ্গীর মহল: বিরাট লাল পাথরে গড়া ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। ললিত লক্ষ্য করলে মুসলমানী স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু কারু-শিল্পের সার্থক শিল্পমিলন। পাথরের বুকে স্বর্ণাঙ্কিত চিত্রগুলির বেশির ভাগই আগুনে ঝলসানো। গাইড সেই দিকে চেয়ে বললে, জাঠরা ওগুলো নষ্ট করে দিয়েছে।

ইতিহাসের কতকগুলো পাতা উল্টে গেল ললিতের মনে, শুধু জাঠ নয় স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও এই ধ্বংসযজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন

ললিতের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল ; খাসমহল শিস্‌মহল কোথায় গুলিয়ে যাচ্ছে, মনে পড়লো একটা বিকৃত মুখ হাওয়া গিলতে চাইছে। সে তাড়াতাড়ি বললে, চলো ওপরে।

ওপরে গিয়ে গাইড গল্প শুরু করলে, ললিত শান্ত হয়ে এলো। জানেন বাবু অন্দর মহলের পাশে এ রকম জায়গা, শুধু গুপ্তহত্যার জন্যে ; বোধ হয় দরবারে যাদের বিচার করা চলবে না তাদের ফাঁসি এখানে হতো, তা ছাড়া বাঁদীদের শাস্তি বেগমরা নিজেরাই দিতেন কিনা !

ললিতের মনে হলো শুধু বাঁদী কেন ? বহু হতভাগ্য বান্দার বলিষ্ঠ অসাড় দেহ এই কূপের মধ্য দিয়ে যমুনার স্রোতে ভেসে গেছে ; এই পাষাণের আড়ালে কত করুণ কাহিনী, কত বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেছে ! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে, ভেসে উঠলো দৃশ্যের পর দৃশ্য,—প্রশস্ত বক্ষ উন্নত ললাট মুসলমান যুবক, কোমরে বাঁধা বাঁকা শমশের, মাথায় অভিজাত আনামা, এসে নামলো প্রাসাদ দ্বারে তার চঞ্চল শ্বেত অশ্ব থেকে, বিজয়ীর হাসি নিয়ে প্রবেশ করলো ভেতরে, কিন্তু আর ফিরলো না। তার নিস্পন্দ দেহ ভেসে গেল যমুনার স্রোতে।

সুচতুর সরকারী আদেশে চারিদিকে লোক ছুটলো সন্ধানে, ফিরে এলো নত মস্তকে। প্রাসাদদ্বারে শ্বেত অশ্ব প্রভুর প্রতীক্ষায় মাটির বুকে খুরের আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

পারস্য থেকে ধরে আনা তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের যুবতী বাঁদী, চোখে বিদ্যুৎ, দেহে সংজ্ঞাহীন আকর্ষণী। বিজয়িনীর গর্বিত মরাল গ্রীবায় এসে পড়লো নিষ্ঠুর কঠিন রজ্জু, একটা নিরর্থক আর্তনাদ, তারপর যমুনার কোলে আশ্রয়। বাদ্‌শার ব্যাকুল প্রশ্ন, কোথায় সে গেল, নিয়ে এসো তাকে। সারা মহলে সন্ধান মিললো না ; বেগম হেসে উত্তর দিলেন, সে বোধ হয় ওই কোনো বান্দার সঙ্গে

পাড়ি দিয়েছে রাত্রে ; জনাবের অভাব কি, আদেশ করুণ লক্ষ বাঁদী এনে দেবো।.....

এত কি ভাবছেন বাবুজী ? গাইড বললে হেসে।

কিছু না, চলো। লজ্জিত হয়ে ললিত পা চালিয়ে দিলে দেওয়ান-ই-আমএর দিকে।

ওই কবরটি বাবুজী লাটবাহাদুর জে, আর, কোলভিন্ সাহেবের ! একটা কবরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে গাইড।

তা এখানে কেন ? জিজ্ঞেস করলে ললিত।

উনি এখানে লাট সাহেব ছিলেন, সিপাই বিদ্রোহের সময় ওকে তারা মেরে ফেলে এই দুর্গে।

ললিতের মনে পড়ে গেল, সিপাই-বিদ্রোহ, ভারতের প্রথম আত্মচেতনা যার ফলে বেচারা কোলভিন সাহেবকে এখানে মাটি নিতে হলো, কিন্তু এখানে মানায়নি বড় বেমানান। সে ক্লান্ত ভাবে বললে, চলো গাইড এবার ফিরতে হবে।

খুশি মনে গাইড বেরোবার রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো।

অফিস ঘরে থমথমে ভাব। ঘর্মাক্ত কলেবরে সুপার সাহেব অফিসে ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বললেন, আউট ল। বেটারা বেহেড, কোন কথার জবাব দেয় না, এটা জেলের মধ্যে বিদ্রোহ। পাগলা ঘন্টি বাজাতে বলুন আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে খবর দিন—জেলে আইন ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র চলছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং পাগলের মত ঘণ্টা বেজে চললো। চারিদিকে সাজ সাজ রব ; রাইফেল বেয়নেট চাপিয়ে জেলরক্ষীদল এসে জড়ো হলো অফিসের সামনে। ঘণ্টাধ্বনি ছাপিয়ে সহস্র কণ্ঠের চিৎকার উঠলো, বন্দেমাতরম্।

সশস্ত্র পলটন নিয়ে হাজির হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর, প্রশ্ন করলেন সুপার সাহেবকে ইংরাজিতে, ব্যাপার কি ?

সামরিক কায়দায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম ঠুকে উত্তর দিলেন সুপার সাহেব, রাজনৈতিক কয়েদীরা লক আপ হতে চাইছে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের লাল মুখ, ঘোর লাল হয়ে উঠলো, হাতের বেতটা নিজের পায়ে একবার ঠুকে বললেন ধমক দিয়ে, টেররিষ্ট। আউট ল। কনস্পিরেটর। রিবেল্স্। এক একটা শব্দের ঝোঁকে সুপার সাহেব চমকে চমকে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদেশ দিলেন, ফলো মি।

কাঁধের ওপর রাইফেল তুলে নিয়ে সেপাই ও জেলরক্ষীদল মার্চ করে চললো তাঁর পেছনে। জমাট বাঁধা সহস্র কণ্ঠে রণোল্লাস ধ্বনিত হলো, বন্দেমাতরম্।

সাত নম্বর ওয়ার্ডের সামনে অমিতাভ সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললে, নিজেদের নিরেট করে সাজিয়ে নাও ভাই পরস্পরের হাত ধরে, বেত চললে শুয়ে পড়বে। ওরা আসছে।

ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল ; জেল প্রাঙ্গণ ভরে উঠলো চটাচট বেতের শব্দে। একটা করুণ চিৎকার উঠলো, উঃ বাবা গো।

দাঁতে দাঁত চিপে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে চেয়ে অমিতাভ বললে, ভীরু আর্তনাদ করছে। মুখের মধ্যে হাত পুরে বন্ধ করতে পারে না। নিজেদের দিকে লক্ষ্য করে বললে, সাবধান ভাই কোন আওয়াজ যেন মুখ থেকে না বেরোয়, যারা দুর্বল তারা ভেতরে যেতে পারো।

আশঙ্কায় শীর্ণ গোটা পাঁচেক মুখ অমিতাভর চোখে পড়ে গেল। তাদের দিকে চেয়ে বললে সে, তোমরা ভেতরে যাও ভাই, তোমরা পারবে না। তাদের মধ্যে একজনের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, সে নত মস্তকে উঠে চলে গেল ওয়ার্ডের দিকে, পেছনে আরো জন তিনেক উঠে গেল।

অমিতাভ নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, এ ভাল। কিন্তু আর্তনাদ অসহ্য।

ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে এলো সাত নম্বর ওয়াডের দিকে। সেপাই সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে ঢুকলেন। তাকে দেখে সত্যাগ্রহীরা সম্বর্ধনা জানালো, বন্দেমাতরম্।

ক্রুদ্ধস্বরে তিনি হাঁকলেন, শালালোক শুয়ারকা বাচ্ছা।

অমিতাভ চিনতে পারলো এই তো ধান সাহেব, মেদিনীপুর জেলার হর্তাকর্তা। কাঁথির শেষপ্রান্ত থেকে চন্দ্রকোণা পর্যন্ত যার শাসন সুপরিচিত। সে দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করলো—বন্দেমাতরম্।

হিংস্র গরিলার মত সাহেবের লাল চোখ দুটো গোল হয়ে বেরিয়ে এলো; কপাল থেকে ঘাম ঝেড়ে নিয়ে সজোরে চালালেন চাবুকের বাড়ি অমিতাভর ওপর। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, বল বেটা বন্দেমাতরম্।

শত শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো, বন্দেমাতরম্।

ক্রোধে উন্মত্ত সাহেব তাঁর সবুট লাথি চালালেন ছেলেদের মধ্যে। গোটা দুই ছেলে শ্বাসরুদ্ধ আওয়াজ করে গড়িয়ে পড়লো।

অনেকে অনেককিছু কল্পনার খোরাক যোগাচ্ছেন ; তবে নিবারণ জানা জোর গলায় প্রচার করেন, এটা নাকি একজন সিদ্ধ-পুরুষের মাদুলি ধারণে সম্ভব হয়েছে, মোটের ওপর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি এনে দিয়েছে এই সম্ভাবনা।

বাড়ির পেছন দিকের গাড়োয়ানদের খবর এবাড়ির বাসিন্দাদের কাছে অপ্রায়োজনীয় হলেও মাঝে মাঝে একটি রমণীর আর্ত ক্রন্দনে বাসিন্দাদের অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এই গাড়োয়ান-রমণীর একমাত্র সন্তান নাকি হাওড়ায় গাড়োয়ানদের হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

রামকালীবাবুর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে, গড়গড়ার নল হাতে বৈঠকখানায় বসে থাকার সময়ও আজকাল বেড়ে গেছে। অমিয়কান্তি কিছুদিন হলো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, আজ তাকে পাঠিয়েছেন পুনরায় কলেজে ভর্তি হবার জন্যে। অমিয় আবার কলেজে ভর্তি হলে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হন।

মাথা নিচু করে বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলো অমিয়কান্তি, তাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন রামকালীবাবু।

কলেজে ভর্তি হওয়া গেল না বাবা !—বললে অমিয়কান্তি।

কেন ?—গম্ভীরভাবে বললেন রামকালীবাবু।

কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজী নয় জেল ফেরৎ ছেলেদের ভর্তি করতে !

অন্য কলেজে চেষ্টা করো !

এরা আবার কিরকম সার্টিফিকেট দেন !—অমিয়কান্তি চিন্তিতভাবে বললে।

রামকালীবাবু স্বভাবসুলভ জলদগম্ভীর গলায় শুরু করলেন, হু ! কি লাভ হলো তোমার ? নিজের ভবিষ্যৎ খুইয়ে কি বা করতে পারলে ? সেইতো আবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাট করতে হবে, তারপর যে যার বাগিয়ে নেবে, আর তোমরা মূর্খ ছেলের দল লেখাপড়া,

বহুদিন পরে এই আত্মীয়তার আহ্বানে ললিত রাজী হয়ে গেল। সে খুশি মনে বললে, চলুন আমার আপত্তি নেই।

তিনজনে এগিয়ে চললো তাজের দিকে ঝাউ গাছের তলা দিয়ে।

তাজের শ্বেত চত্বরে উঠে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সবাই দেখতে দেখতে ঘুরে চললো চারিপাশ। যেন ভাষাহীন হয়ে পড়েছে তিনজনেই।

তাজের পশ্চাৎ দিকে এসে ভদ্রলোকটি বললেন, আসুন এইখানে একটু বসা যাক। তারা বসে পড়লো বাঁধানো চত্বরের ধারে ; যমুনার ক্ষীণ জলরেখা দূরে বয়ে চলেছে, ললিতের মনে হলো তুষার-শুভ্র-স্মৃতির পাদদেশ স্পর্শ করে বয়ে চলেছে হতগর্ব কালস্রোত, পাষাণের প্রতি স্তরে যেন যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে কবির সেই কথা—ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।

দেখো পরের কথা ধার করে আমি বলছি, আমি এখুনি মরতে প্রস্তুত যদি তুমি এমনি একটা স্মৃতিমন্দির তৈরি করো, উঁচু সুরেলা গলায় মহিলাটি বললেন স্বামীর দিকে চেয়ে।

তৈরি করতে পারতুম যদি আমার অধীনে বিশ সহস্র দাস থাকতো, আর রাজকোষ থাকতো।

কেন তোমার কারখানা কি কম ?

কারখানার টাকায় এ সব করা চলে না, সে টাকা কারখানারই প্রাপ্য, তার তাগিদ অনেক বেশি।

তা হলে আর কি হবে। আমার মরা হলো না। ছদ্ম নিরাশায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মহিলাটি।

ললিত চাইল তাঁর মুখের দিকে। একটু কটাক্ষ করে তিনি আবার শুরু করলেন, দেখছো তখন নারীর মূল্য কি ছিলো ?

তা দেখছি, কিন্তু ফতেপুর সিকরীতে দেখা সেই পাশা খেলার ছক সেই রঙ-বেরঙের কাপড় পরা জীবন্ত নারী ঘুটিগুলোর কথা তুমি

যে এত শিঘ্রি ভুলে যাবে তা তো জানা ছিল না। হাসতে হাসতে বললেন ভদ্রলোকটি।

সে তো দাসীদের নিয়ে খেলা।

এটা রাণীদের নিয়ে এই না.?

যাও তুমি ভারি নিন্দুক। রাগের ভান করে ফিরে তাকালেন মহিলাটি ললিতের দিকে, আচ্ছা আপনি বলুন তো তাজ দেখে আপনার কি মনে হয়?

এই সব আলোচনা ললিতেব মোটেই ভাল লাগছিল না তবু ভদ্রতার খাতিরে উত্তব দিতে হলো, ইতিহাসের এখানে নীরব থাকাই ভাল, আর যদি তার আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে তা হলে এই কথাই বলবো, সমাজের যে সৃষ্টিশক্তির অপব্যয় হতো অন্য তুচ্ছ কারণে, সেই শক্তি সার্থক হয়েছে এখানে, এইটেই শুধু বারে বারে মনে হচ্ছে। সাজাহান, মমতাজ উপলক্ষ্য মাত্র, সে যুগের এটা সার্থক শিল্পসৃষ্টি, এই সৃষ্টির গৌরবে সাজাহানের প্রেম অমর হলো।

ঠিক ঠিক, শিল্পীর মত কথা বটে, ভদ্রলোকটি বললেন হেসে।

মহিলাটি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন শুনে যে মমতাজ উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি থেমে বললেন, আমার কিন্তু মনে হয় মমতাজই এর প্রাণবন্ত প্রেরণা। যেমন কবিতার ভাব আর প্রকাশভঙ্গী তেমনি মমতাজ আর তাঁর স্মৃতি সৌধ একই সূত্রে গাঁথা।

ললিত এর উত্তর চেপে গেল। ভদ্রলোকটি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, বাঃ বাঃ তুমি তো বেশ কথা বলেছ। আমার একটা ইংরেজি কবিতা মনে পড়ছে।

কবিতা, থাক চলো এইবার ভেতরটা দেখে আসি—বললেন মহিলাটি। তিন জনেই উঠে দাঁড়িয়ে এগোলো সামনের দিকে।

তাজের অন্দরে প্রবেশ করতেই, ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধে আনমনা হয়ে গেল ললিত, একজন ফকির সমাধির পাশে বসে কোরাণ থেকে

তাই নাকি জানি না তো—নির্লিপ্ত স্বরে বললে অমিতাভ, তারপর অন্যমনস্ক ভাবে মুখ ধুতে লাগলো।

দূরে একজন রাজবন্দী যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন অমিতাভকে, এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে ; অমিতাভ তাঁর মুখের দিকে চাইতেই কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো। তিনি দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

তোমার নাম কি ভাই ?

অমিতাভ রায়।

কোথায় গ্রেপ্তার করেছে ?

মেদনীপুরে।

ওঃ ! একটু হতাশ ভাবে তিনি যেন ফিরতে যাচ্ছিলেন খানিকক্ষণ থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাগবাজারে তোমরা কখনও ছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

মিত্তির বাড়িতে ?

হ্যাঁ—অমিতাভর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।

আমায় চিনতে পাচ্ছ না মিনটু ?

বহুদিনের বিস্মৃত একটা দৃশ্য অমিতাভর চোখে ফুটে উঠলো, সুজিৎদা আপনি।

হ্যাঁ আমি, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো।

সুজাতাদি কোথায় ?

জানি না ভাই, পাঁচ বছর আগে শেষ চিঠি পেয়েছি।

আপনি সেই থেকেই জেলে আছেন ?

হ্যাঁ।

কষ্ট হয় না ?

তাঁর মুখে একটুকরো হাসি এসে মিলিয়ে গেল বললেন, অভ্যাস হয়ে গেছে।

॥ ৭ ॥

শিবকালীবাবুর বাড়িতে ধুমধাম্ পড়ে গেছে। অমিতাভ একটা ঘরে ইজিচেয়ারে বসে লক্ষ্য করছে বারান্দায় কর্মব্যস্ততা। পাশের কেদারায় রুনু বসে ; তার চোখের দৃষ্টি ফিরে ফিরে পড়ছে অমিতাভর মুখে।

আজ তোমার না গেলেই নয় অমিতাভ ?

আজই যেতে হবে, মা বড় ভাবছেন।

জ্যাঠামশায় শহরের সমস্ত কংগ্রেসকর্মীদের আজ খাওয়াবেন।

হঠাৎ এত খাওয়াবার ধুমধাম ? হেসে বললে অমিতাভ।

অনেকদিন পরে একটু মিলেমিশে আনন্দ করা।

আমি কিন্তু আনন্দের নাগাল পাচ্ছি না রুনু।

তা জানি গো জানি, মায়ের আদরের ছেলে মায়ের জন্যে মন কেমন করছে।

না না ঠিক তা নয়।

তুমি একটা পেশাদার সৈনিক, কেবল লড়াই ভালবাস। কটাক্ষ করে বললে রুনু। অমিতাভ চঞ্চল হয়ে একটা নিঃশ্বাস নিলে।

শিবকালীবাবুর আওয়াজ পেয়ে সোজা হয়ে বসলো দুজনে। শিবকালীবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, তুমি এই রাত্রের ট্রেনেই তাহলে যাবে অমিতাভ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনেকদিন বাড়ি ছাড়া, তোমাকে আর আটকাবো না। তাই যাও, আমি তোমার জন্যে ড্রাইভারকে বলে রেখেছি, ঘণ্টাখানেক পরেই গাড়ী নিয়ে আসবে। কথা শেষ করে তিনি চলে গেলেন। অমিতাভ রুনুর দিকে চেয়ে বললে, তোমার আমার এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা জ্যাঠামশায় কি চোখে দেখেন সুচিত্রা ?

আমি ঠিক কিছু বলতে পারবো না।

আমার কিন্তু মনে হয় উনি তোমার মুখ চেয়েই—

হবে। জানো অমিতাভ উনি একদিন আমাকে বিধবা-বিবাহ নিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি এড়িয়ে যাচ্ছি দেখে আর সে সম্বন্ধে কথা পাড়েননি।

ক্ষণিকের জন্যে অমিতাভর মন আনন্দে ভরে উঠলো; সে সঙ্কোচের স্বরে বললে, কেন তুমি আবার বিয়ে করবে না রুনু? বাল্যকালের একটা ঘটনাকে এ ভাবে মর্যদা দেবার কোন যুক্তি নেই।

তুমি ভুল বুঝছো। প্রায় মনে মনে বললে রুনু।

মোটেই না, তুমি যদি বলো আমি নিজে গিয়ে কথা পাড়বো জ্যাঠামশায়ের কাছে।

না না তুমি ঠিক বোঝনি, ও কথা থাক।

রুদ্ধকণ্ঠে অমিতাভ বললে, বোঝাটা যেন তোমারই একচেটিয়া?

জ্যাঠামশায় ছাড়া, বাবার কথাটা ভেবে দেখ দয়া করে।

চোখের সামনে পর্দাটা সরে গেল অমিতাভর; একটা মুখ, কোথায় শিবকালীবাবু কোথায় ব্রজেন্দ্রনাথ। একই মাতৃগর্ভে জন্ম-গ্রহণ করে ও ছুজনের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান। সে ফিরে চাইল; রুনুর ফ্যাকাশে গাল বেয়ে ছুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো অমিতাভর হাতে। ক্রন্দনবেগে ঝোলাটে মুখখানা তুলে ধরলো অমিতাভ ছুহাত দিয়ে; চোখ বন্ধ করে রুনু তার হাতছুটো চেপে ধরে ফুলে ফুলে উঠলো।

নিরেট নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলোর মধ্যে শিবকালীবাবুর কণ্ঠস্বর চেতনা এনে দিলে; তারা ছুজনেই নিজেদের সামলে নিলে।

তিনি এসে বললেন, তোমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে অমিতাভ। রণজিৎ আর রুনু, তোমরা গিয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসো।

তাঁকে নমস্কার করে অমিতাভ মোটরে গিয়ে বসলো, তারপর রুনু; গাড়ী চালাবার জন্যে রণজিৎ গিয়ে বসলো সামনে।

না তেমন কিছু না।

ভেতরে চলো তোমার মা দাঁড়িয়ে আছেন।

রান্নাঘরের সামনে মাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো অমিতাভ, তাঁর মুখের দিকে না চেয়েই।, তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। নিজের অজ্ঞাতে অমিতাভর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো, হারাধনবাবু চলে গেলেন সেখান থেকে।

মৃন্ময়ী দেবীর এতদিনের জমাট কান্না যেন তুষারের মত গলতে শুরু করেছে; অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, তোরা বসগে আমি চা আনছি।

তিনি তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে: অমিতাভ এগিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে।

দেড় বছরের মধ্যে তার নিজের ঘরের কোন পরিবর্তন চোখে পড়লো না। যেমন অবস্থায় রেখে সে চলে গিয়েছিলো সেই অবস্থাতেই আছে। এমনকি বইগুলো যেমনভাবে ছড়ানো ছিলো টেবিলে, সেগুলো সেইভাবেই রয়েছে। তার অতি প্রিয় পুরানো চটিটা একই জায়গায় মেজেতে পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও ধুলোর চিহ্ন নেই। কে যেন নিপুণ হাতে সব ঝেড়ে-পুঁছে রেখেছে। আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সে একেবারে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়লো। অমিয়কান্তি তার পাশে বসে দুষ্টুমিভরা গলায় বললে, ঠিক হয়েছে যেমন চেহারার গর্ব ছিলো, সেটা চূর্ণ হয়েছে। নিজের মুখখানা অনেকদিন বোধ হয় দেখিসনি? দেখলে মূর্চ্ছা যাবি।

নিয়ে আয় তো আয়নাটা, আজ দেড় বছর মুখটা দেখিনি।

দেয়াল থেকে আয়নাটা, পেড়ে তার হাতে দিয়ে বললে অমিয়কান্তি, এই নে দেখ আমি স্মেলিং সল্ট-এর শিশিটা খুঁজে রাখি।

নিজের চেহারা দেখে অমিতাভ যেন দুর্বল হয়ে পড়লো; হাতটা

তুলে আয়নাটা ফেরৎ দিতেও যেন তার ক্লান্তি লাগছে। অমিয়কান্তি হেসে বললে, জানিস মিনটু আমিও জেল খেটে এসেছি।

কি বললি জেল খেটে এসেছিস ?

আজ্ঞে হ্যাঁ বীরপুরুষ। তার কথা শেষ হবার পুর্বেই অমিতাভ তাকে জড়িয়ে ধরলে, টাল সামলাতে না পেরে অমিয়কান্তি গড়িয়ে পড়লো বিছানায় ; ঠিক সেই সময় মৃন্ময়ী দেবী ঘরে ঢুকে বললেন, স্নান করা নেই, কাপড় ছাড়া নেই, দুজনে বিছানায় গড়াতে শুরু করেছিস। নে ওঠ চা খেয়ে নে।

দুজনে উঠে হাসতে হাসতে চায়ের কাপ তুলে নিলে। মৃন্ময়ী দেবী বলে গেলেন, চা খাওয়া সেরে স্নান করতে যাবে মিনটু।

চা খাওয়া শেষ হতে অমিয়কান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুই যা স্নান করতে, আমি এখন যাই পরে আসবো।

সে চলে গেল ; অমিতাভ এগোলো কলতলার দিকে।

কলতলায় সবগুলো বালতিতে গরম জল ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে রাখা হয়েছে ; সে গিয়ে বসলো একটা টুলে। মৃন্ময়ী দেবী কাপড় সেঁটে একটা গামছা হাতে এসে বললেন, বসদিকি তোর পিটটিট্‌গুলো ঘসে দি, গায়ে যেন এক ইঞ্চি ময়লা বসে আছে।

ব্যাপার বুঝতে পেরে হতাশভাবে চাইল অমিতাভ ; তার মুখের চেহারা দেখে ছোট বোনটা বলে উঠলো, দেখো মা, দাদা আমার মত রেগে যাচ্ছে চান করতে।

আসলে অমিতাভর রাগ মোটেই হয়নি, ছোট বোনটার সামনে বুড়ো বয়সে মায়ের সেবা নেওয়ার সঙ্কোচ কাটাতে পারছে না। গা, মাথা, পিঠ, এমন কি কানের গোড়া পর্যন্ত সাবান দিয়ে ঘসতে ঘসতে বললেন মৃন্ময়ী দেবী ক্ষুব্ধ সুরে, পিঠে এতো বেতের দাগ।

কোন উত্তর না দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল অমিতাভ। রাজ্যের ঘুম যেন তার দু চোখে নেমে এসেছে।

॥ ১ ॥

পাথরের দেওয়ালে চূণকাম করা ছোট ঘরটার মধ্যে ললিত একটা অর্ধ সমাপ্ত ছবির ওপর তুলি বোলাচ্ছে। এ ছবিটা আজ তাকে শেষ করতেই হবে, কিন্তু কোন মতে মন বসাতে পারছে না। সৃষ্টির বাসনা যেন মরীচিকার মত নাগালের বাইরে তাকে হাতছানি দিয়ে চলেছে; মিলনাতুর পঙ্গু মন বারে বারে অক্ষম চেষ্টায় নির্জীব হয়ে পড়ছে। মাধুর্যহীন এই দাসত্ব সে কি করে করবে? হাতের তুলি থামিয়ে পায়চারি শুরু করলে ললিত: একি নিরুদ্দেশ যাত্রা। সমগ্র চেতনা রাজ্যের ওপর একটা কলঙ্কিত মুহূর্তের বেদনাদায়ক আধিপত্য; প্রেতাত্মার মত ভয়াল অতীতের অবিচ্ছেদ্য অনুসরণ। সম্মুখে অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের অপরিসীম শূন্যতা। হতাশভাবে বসে পড়লো সে খাটের ওপর। বেদনায় ভরে উঠলো তার মন; সেকি আর ছবি আঁকতে পারবে না? না না তা হলে কি নিয়ে থাকবে! এ দুর্বলতা তাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। শিল্পীজীবনের পথে তাকে যিনি এগিয়ে দিয়েছেন, মনে পড়ে গেল তাঁর কথা; মনে পড়ে গেল এই অখ্যাত অজ্ঞাত সাধকের দুঃখদৈন্য ভরা জীবনসংগ্রাম। কলকাতার এই অবজ্ঞাত শিল্পপ্রতিভা। অভাবক্লীষ্ট পারিবারিক সমস্যার মধ্যে তাঁর অমরত্ব অভিলাষের সমাধি। ক্রেতার আদেশে বৈষয়িক শিল্পসৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিভার অপমৃত্যু। তাঁর একদিনের স্বীকারোক্তি: ললিত, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি পেটের তাগিদে জুতোর কালির প্রচারশিল্পী হবো।

অবসাদে যেন ভেঙে পড়লো ললিত। অনেক কষ্টে সে পুর্বাচার্যদের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করলে; শিল্পীর জীবনে সংগ্রাম নূতন নয়।

খুশি মনে টাকাগুলো গুণে নিয়ে ললিত হোটেলে ফিরলো। ক্ষীণ আশার আলো উঁকি মারছে তার মনে; নূতন নামে, নূতন পরিবেশে, সৃষ্টির গৌরবে হয়তো তার নবজন্ম হবে। নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন বর্তমান, অজানা ভবিষ্যৎ হয়তো সে জয় করতে পারবে।

॥ ২ ॥

গান্ধী দি সেভিয়ার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার। আকাশে একটা হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে বললে ভূতনাথ ওরফে ভুতো।

এটা আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার একটা অছিলা মাত্র—ক্ষুব্ধভাবে বললে অমিয়কান্তি তাকে কটাক্ষ্য করে।

মিত্তির বাড়ির ছাতের ওপর দারুণ জটলা পাকিয়ে উঠেছে রাজনীতি নিয়ে। অমিতাভ আলসেতে ভর দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বয়াটার দোলানি লক্ষ্য করছে। অমিয়কান্তি ভারিক্কী ভাবে তর্ক করে চলেছে ভুতোর সঙ্গে। নির্মল, শান্তিরাম, শরৎ ইত্যাদি প্রধানত শ্রোতা হলেও মাঝে মাঝে ফোড়ন দিচ্ছে সুবিধা মতন। সদ্য করাচী কংগ্রেস ফেরত ভূতনাথ তথাকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে তর্কের জালে জড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর একদল লোক যে আস্থা হারিয়েছে, এই কথা অমিয়কান্তি মানতে চায় না আর ভূতনাথ বোঝাবেই।

সংগ্রামের চরম মুহূর্তে সংগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া নওজোয়ান সমিতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করে, তাই তারা কালো ফুলের মালা পরিয়েছে নেতাদের গলায়, তাদের গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে, তাদের বক্তৃতার সময় অপমান করে নিজেদের বিক্ষোভ জানিয়েছে এ আমি নিজের চোখে দেখেছি, বললে ভূতনাথ একদমে।

এটা নিছক গুণ্ডামী, বললে শরৎ।

গুণ্ডামী হতে পারে কিন্তু হাওয়া কোনদিকে বইছে বোঝা যায়।

নিছক উগ্রপন্থা। স্বাধীনতা সংগ্রামের শত্রুতা করা—বললে অমিয়কান্তি।

মোটেই তা নয়, মধ্যপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ।

আহা লোকটি বড় ভাল, পোড়াকপালী রুনুর কথা আর কি বলবো। শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর কান্নার মত শোনালো।

আচ্ছা মা, রুনুর তো আবার বিয়ে দিলেই পারে ?

সেকি হয়, হিন্দু ঘরের বিধবা।

কেন আইন পাশ করা আছে, বিয়েও তো আজকাল হচ্ছে।

সে কি আর সবাই পারে।

অমিতাভ চুপ করে গেল ; তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে বললেন মৃন্ময়ী দেবী, তোরা একসঙ্গে জেলের মধ্যে ছিলি ?

মায়ের প্রশ্নে হেসে ফেললো সে।

তিনি বললেন, হাসছিস যে ?

তোমার কথায়। একসঙ্গে মেয়ে পুরুষ কি জেলের মধ্যে থাকে, আলাদা আলাদা রাখা হয়।

অত জানি না বাপু, মিত্তিরদের ছোটকর্তা সেদিন তোকে দোষ দিয়ে কি সব বলছিল তাই—

কি বলছিল ?

বলছিল, ওই মিনটুর সঙ্গে মিশে রুনু স্বদেশী করছে, জেলে যাচ্ছে, তুই নাকি এ সবের জন্য দায়ী।

ওঃ এই কথা।

তুই আর ওদের কোন কথায় থাকিসনি মিনটু, রুনুকে চিঠিপত্তর লেখা ছেড়ে দে, ওই ব্রজেনবাবুটি লোক মোটেই সুবিধের নয়, কখন কি বলে বসবে।

আচ্ছা আচ্ছা আমি আর চিঠি লিখবো না।

তোকে একবার মালতীর ওখানে যেতে হবে, ওর বাবা হাস-পাতালে কেমন আছেন জেনে আয়।

অমিতাভর একটা মুখ মনে পড়ে গেল, ললিত, তার আবাল্য সাথী আজ খুনী, ফেরারী আসামী। সৌম্য, সুকান্তি, নিরীহ ললিত যে খুন

করতে পারে এ-কথা কে কবে কল্পনা করেছিল। সে বেদনাতুর গলায় বললে, আচ্ছা মা ললিত কি সত্যিই সুরেশ ডাক্তারকে খুন করেছে।

কি জানি বাপু।

মালতীদি কি বলে?

ও আবার কি বলবে? আমার কিন্তু ভাল লাগতো না ওই সুরেশ ডাক্তারের আসা যাওয়া। অত কথা তোর জেনে দরকার নেই—যা তাড়াতাড়ি খবরটা নিয়ে আয়।

মা কথাটা চেপে যাচ্ছেন দেখে প্রশ্ন না করে অমিতাভ উঠে চলে গেল।

উঠোন পেরিয়ে মালতীদের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তেই অমিতাভর কানে এলো কর্কশ কণ্ঠে মালতী কাকে বলছে—আপনি চলে যান বলছি চলে যান। পরক্ষণেই একটা বেহায়ার মত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, আহা রাগ করো কেন গো, আমি না হয় যাচ্ছি, টাকাটা তুমি নাও লক্ষ্মীটি। তারপর চিৎকার করে উঠলো মালতী, ও টাকা চাই না, আমি উপোস করে মরবো, আপনি বেরিয়ে যান বলছি নয়তো লোক ডাকবো। ভেতর থেকে পদশব্দ শুনে অমিতাভ দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো; ব্রজেন্দ্রনাথ অস্ফুটকণ্ঠে কি সব বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। সে ভেতরে চলে গেল।

তাকে দেখে প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো মালতী, তুই আবার কি করতে এলি, চলে যা আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

থতমত খেয়ে অমিতাভ বললে আস্তে আস্তে, মা, মা পাঠালেন মেশোমশায় কেমন আছেন জানতে।

মালতী প্রায় আপন মনে বললে, ডাক্তারেরা বলেছেন কোন আশা নেই।

এরপর কি কথা বলবে খুঁজে না পেয়ে অমিতাভ মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। মালতী কাছে এসে তার গালে কাল বেতের দাগ

দিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে জল ঢেলে ফের এসে বসলো কাগজ পড়তে।

কাগজ পড়তে পড়তে এক সময় তার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওরা খুন করবে কমরেডদের। এত দেশ থাকতে মিরাটে নিয়ে গিয়ে তারই ষড়যন্ত্র চলেছে।

অমিতাভ এসে দরজায় উঁকি মারলো; সুরেনকে দেখে ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে বললে, আরে তুমি এখানে সুরেনদা? এ ঘরে এলে কবে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললে সুরেন, এসেছি এই কদিন, ওদিকে এক বড়লোক এসে আমায় ঘরছাড়া করেছে।

মালতীদি কোথায় গেলেন?

মালতী-ফালতী জানি না।

অমিতাভ লক্ষ্য করলে মালতীদির ওঘরে যাবার দরজার সামনে একটা ভাঙ্গা র‍্যাক দাঁড় করানো আর তাতে নানা রকম আজে বাজে জিনিস জমা করা।

সুরেনের কাছাকাছি গিয়ে বললে সে, সুরেনদা আপনার কাছে একটা ক্ষমা চাইবার আছে—এতদিন সুযোগ পাইনি।

সুরেন তার দিকে চেয়ে নির্লিপ্তভাবে বললে, কারণ?

আপনার মনে আছে সেই যে আমি বস্তিতে গেছলাম?

কথাটা শুনেই সোজা হয়ে বসলো সুরেন। তারপর কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে রূঢ়ভাবে বললে, এই নাও দেশভক্ত পড়ে দেখো, তুমি যাকে অশ্রদ্ধা করে সেদিন ক্লাইবের সঙ্গে তুলনা করেছিলে, সেই ইংরেজ তোমার চেয়ে তোমার দেশের জন্যে কত পরিষ্কারভাবে চিন্তা করেন। তোমার দেশের জন্যে কতখানি দুঃখকষ্ট বরণ করে নিয়েছেন।

লজ্জিত অমিতাভ সঙ্কুচিত ভাবে বললে, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার

বলার সুযোগ পাচ্ছি শুধু শ্রমিক সঙ্ঘের দৌলতে। তোমারি মত ভদ্র মানবপ্রেমিক মহৎ লোক যাঁরা প্রথমে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদেরই চেষ্টায় আমার এই অবস্থার উন্নতি।

শেষের দিকে সুরেনের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠলো; বাল্যের সেই অসহায় দিনগুলো বুঝি স্মৃতির সমুদ্রে চঞ্চল হয়ে উঠেছে; সে একটু সামলে নিয়ে বললে, তুমি যেও মিনটু তবে কোন হাঙ্গামা হলে সরে যেও। তোমাদের কংগ্রেসী নেতার পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের বিপক্ষে দাঁড়িও না, সেটা আমি সইতে পারবো না।

ঠিক বুঝতে পারলুম না।

একজন কংগ্রেসী নেতা আজ সভাপতি, আর তার সঙ্গেই যত মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে শ্রমিক সঙ্ঘের।

দারুণ অস্বস্তিতে অমিতাভ ছটফট করে উঠলো; মুখের মধ্যে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে বেরিয়ে এলো।

তারদিকে চেয়ে একটু হেসে বললে সুরেন, আমি জানি তুমি এ সহ্য করতে পারবে না। তুমি যেও না আমার অনুরোধ, এতে তোমাদের কংগ্রেসের কোন ক্ষতি হবে না। এটা আমাদের নিজেদের সমস্যা।

সেই ভাল আমি যাবো না সুরেনদা। চিন্তিতভাবে উঠে অমিতাভ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

সুরেন তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে জামা পরে খালি পায়ে বেরিয়ে গেল, ঘরের দরজায় কুলুপটা টিপে দিয়ে।

বলেছিল, তুমি বুঝবেনা আমাদের—ভাবলে সে। অধিবেশন শেষে মজুরদের মুখের দিকে চাইতে চাইতে হল থেকে বেরিয়ে গেল; মজুররা যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় দাঁড়াতেই একটা বলিষ্ঠ হাত তার কাঁধে চাপলো, উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, তুমি যে আসবে না বলেছিলে মিনটু ?

না এসে পারলুম না সুরেনদা, ক্লান্তভাবে উত্তর দিলে সে।

কেমন দেখলে ?

ভাল বুঝতে পারলুম না, তোমরা জয়ী হয়েছো ?

জয় অবশ্য আমাদেরই, কিন্তু এই অনৈক্যের কুফল কিছুদিন ভোগ করতে হবে শ্রমিকদের; অন্য উপায় অবশ্য ছিল না। চিন্তিতভাবে সুরেন বললে অমিতাভকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে।

আচ্ছা সুরেনদা তোমাদের ধ্বনির মধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অশ্রদ্ধা করা হয়, এর ফল কি ভাল ?

সুরেন কোন উত্তর না দিয়ে হাসলে, এ-নিয়ে কথা না তোলাই এখন ভাল, কারণ আমরা দুজনেই ক্লান্ত, চলো ওই ট্রামটায় উঠে পড়ি।

একটু হেসে বললে অমিতাভ, খালি পা না হলে বুঝি বিপ্লব করা যায় না সুরেনদা ?

না না আজ তাড়াতাড়ি জুতো পরতে ভুলে গেছি। লজ্জিত ভাবে বললে সুরেন।

চোখ দিয়ে। রামকালীবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, চলো ভেতরে, গাড়ীতে কি রকম ভিড় ছিলো ?

সবাই ভেতরে চলে যাবার পর অমিতাভ বললে, তুই যা অমি, আমি একটু কাজ সেরে আসি শ্যামবাজারে।

অমিয়কান্তিকে প্রায় একরকম ঠেলে দিয়ে অমিতাভ সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে ফিরে অমিতাভ যখন বাড়ি ফিরলো তখন হারাধনবাবুও রবিবারের দিনে খেতে বসে গেছেন। তাকে দেখে মৃন্ময়ী দেবী বললেন, এতো বেলা পর্যন্ত কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াস ?

তার মুখের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে হারাধনবাবু বললেন, মিনটু কি করবে কিছু ঠিক করতে পারলে ?

না, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

যা হোক একটা ঠিক করা উচিৎ, লেখাপড়া না করো একটা চাকরীর না হয় চেষ্টা করতে পারি, আমাদের অফিসে যদি করো।

আমায় আর কিছুদিন সময় দিন।

ভাল, তবে আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি ঠিক করে নেওয়া ভাল।

অমিতাভর হাসি পেল বাবার কথায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সংগ্রামের ডাক আসবে আর সে তখন টুলে বসে ছককাটা খাতায় বড় বড় টাকার অঙ্ক বসিয়ে যাবে একথা যে কি করে বাবা ভাবতেও পারেন।

হারাধনবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, মিনটু আমি জানি তুমি কি ভাবছো। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ চেয়ে আর আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিৎ নয়।

এ সময়ে কথাটা চেপে যাওয়াই অমিতাভর কাছে সহজ মনে হলো। শুধু মা কেন, বাবাও আজকাল কেমন যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। তাকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

মৃন্ময়ী দেবী বললেন, দাঁড়িয়ে কেন ? বেলা কি হয়নি, স্নান সেরে খেয়ে নে।

অমিতাভ বেরিয়ে গেল ধীরপদে। মৃন্ময়ী দেবী স্বামীকে বললেন, ছেলেটা আজকাল দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

হবারই কথা। কলেজে ভর্তি হলেই পারে, তাও হবে না। চাকরী করারও ইচ্ছে নেই।

আমার কিন্তু মনে হয় অন্যরকম। চারদিক চেয়ে বললেন মৃন্ময়ী দেবী।

কি ?

ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও, বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে হেসে চাইলেন হারাধনবাবু তাঁর দিকে, তারপর বললেন ঠাট্টার সুরে, একই কৌশল প্রয়োগ পিতা পুত্রের ওপর।

মৃন্ময়ী দেবীর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো ; ক্রোধের ভান করে বললেন, তা বইকি ? নিজে ক্ষেপে গেছলেন এখন আমার দোষ ? কে তোমায় সেধেছিলো ?

দেখো চেষ্টা করে, মিনটুকে রাজী করাতে পারো যদি, আমার আপত্তি নেই। খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন তিনি।

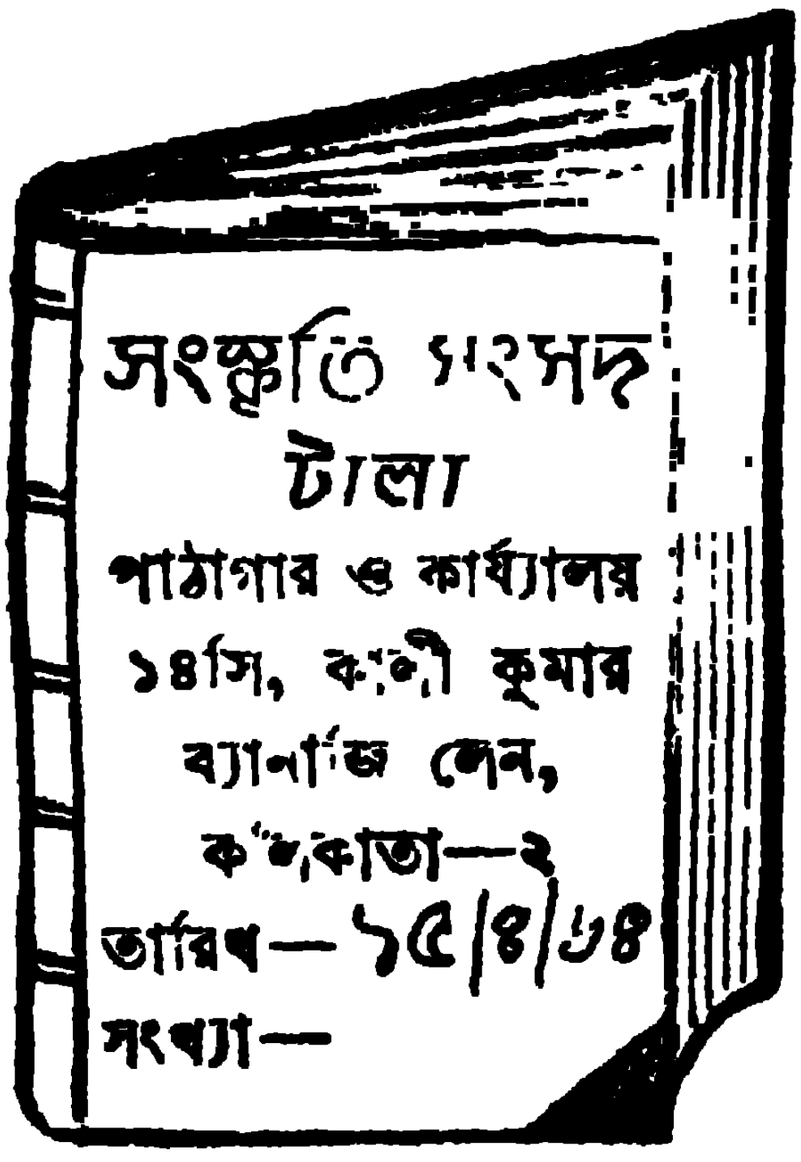

॥ ৬ ॥

মিত্তিরবাড়ির সীমানায়, নানা জনের নানা সমস্যাসঙ্কুল ঘূর্ণাবর্তে একটি অসহায় জীবন প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে, সেটা লোকচক্ষুর অগোচরেই রয়ে যায় বুঝি ! প্রন্থিল জীবন নিয়ে অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম যাদের করতে হয় অন্যের কথা চিন্তা করবার অবসর কই তাদের। তবু তার মধ্যে মৃন্ময়ী দেবী অমিতাভকে দিয়ে মালতীর খবর নিয়েছেন ; কিন্তু মালতী আর তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিতে প্রস্তুত নয় ; বার বার এই অযাচিত সাহায্য তাকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। সে এই উঞ্ছবৃত্তির শেষ করতে চায় ; সে মরবে, শুয়ে শুয়ে সসম্মানে মরবে, তবু দয়ার দান আর গিলতে পারবে না। একবার তার মনে হয়েছিল দাসীগিরি করে একটা পেট চালিয়ে নেবে, কিন্তু আজন্মসঞ্চিত সংস্কার তাতে বাদ সেধেছে ; পরের বাড়িতে দাসীগিরি করার চেয়ে ব্রজেন্দ্র নাথের সাহায্য গ্রহণ, তাঁর মনোরঞ্জন তার কাছে অনেক সহজ অনেক সম্মানজনক মনে হয়। কিন্তু তাও অসম্ভব। তাই শেষ পন্থা বেছে নিয়েছে আত্মহত্যা। দুদিন জলগ্রহণ না করে সে ভাবছে, এইভাবে অবাঞ্ছিত জীবনটা নষ্ট করবে। গলায় দড়ি দিতে ভয় হয়, কাপড়ে আগুন জ্বালাবার কথাও ভাবতে পারে না। বিষ খেতে পারে, কিন্তু পাবে কোথায় ? আইনের বাধা ! আইনের কোন অধিকার নেই তাকে মরার সহজ উপায় থেকে বঞ্চিত করার। জীবনধারণ যেখানে অসম্ভব সেখানে আত্মহত্যা আইনের সাহায্যে বন্ধ করতে যাওয়া তার কাছে হাস্যকর মনে হয় ! সে মরবেই ! তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই তো দুদিন না খেয়ে মাথাটা ভাল করে তুলতে পারছে না আর কিছুদিন দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকলেই তার মুক্তি।

মালতীদি ! ও মালতীদি !

॥ ৭ ॥

সকাল ন'টার সময় অমিতাভ সুরেনের দরজার কড়া ধরে বারকতক নাড়া দিতেই দরজা খুলে ঘুমজড়ানো চোখে এসে দাঁড়ালো সুরেন।

ভেতরে ঢুকে তক্তপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলে, খবর কি? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলে যে?

নর্দমার ধারে মুখ ধুয়ে নিতে নিতে বললে সুরেন, আর খবর। কাল সারা রাত ভুগিয়েছে।

কেন কি হলো?

হবে আবার কি, সারা রাত ওই গর্তের মধ্য দিয়ে তোমার দিদির তদবির করতে হয়েছে।

কি করছিল মালতীদি? বিস্মিত স্বরে বললে অমিতাভ।

রাত্রি একটার পর উঠে কি মতলবে যেন দড়ি যোগাড় করে আনলে রান্নাঘর থেকে—

শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে অমিতাভ, তারপর?

বেগতিক দেখে গলাখাকরানি দিয়ে জানিয়ে দিলাম আমি জেগে আছি। আমার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি দড়ি ফেলে আবার শুয়ে পড়লো মাদুরে, তারপর থেকে আমাকে মাঝে মাঝে গলাখাকরানি দিতে হয়েছে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

খাওয়াতে পেরেছো?

হ্যাঁ তা পেরেছি।

এখন কি করা যায় বলো তো।

একমাত্র উপায় ওঁকে কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া, নয় তো কোন একটা গোলমাল করে বসবে।

কি কাজই বা করবে। আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

অমিতাভ সান্ত্বনা দেবার ছলে বললে, মালতীদি তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি, আজকের মত খেয়ে নাও তারপর সব ঠিক করে দিচ্ছি।

তুই জানিস না মিনটু সবাই ফন্দি এঁটে সাহায্য করে, আমি অনেক দেখলুম, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আপনার প্রলাপ শোনবার সময় নেই—কড়া সুরে সুরেন বললে।

অনুরোধ করলে অমিতাভ, খেয়ে নাও মালতীদি তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

অমিতাভর দিকে চেয়ে সুরেন বললে, আমি চললুম এখন, কাজ করার ইচ্ছা থাকলে জেনে নিও—একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। তবে আর আমি ভাত রেঁধে খাওয়াতে পারবো না বলে দিচ্ছি। নিজের ঘরে ঢুকে একটা মুখের শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে সুরেন।

খাওয়া শেষ করে জামা গলিয়ে সুরেন যখন বেরোতে যাবে, অমিতাভ এসে ফেরৎ দিলে ধোয়া থালা দুটো। সুরেন বললে, কি ঠিক হলো?

কাজ করতে রাজী আছেন শুধু ঝিগিরি ছাড়া।

ভাল কথা, আমার এক দূর সম্পর্কের মাসি আমাদের চটকলের কাছে তেলেভাজা ছোলা মুড়ির দোকান করে, সেখানে কোন একটা ব্যবস্থা করে দেবো, পেশা স্বাধীন হবে, কুলীগিরিও করতে হবে না, দেখবারও একজন হবেন।

তাই করে দাও সুরেনদা, নয়তো ও ঠিক আত্মহত্যা করে বসবে।

আচ্ছা আচ্ছা এখন যাই আমার অনেক দেরী হয়ে গেল। দরজার কুলুপটা টিপে দিয়ে হনহন করে চলে গেল সুরেন। অমিতাভ বাড়ি ফিরলো।

॥ ৮ ॥

বৈঠকখানায় একান্তে বসে রামকালীবাবু গড়গড়ায় টান দিচ্ছিলেন, সেখানে দেখা দিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শিবকালীবাবু আর রুনু। মনে হলো তাঁদের মধ্যে একটা অমীমাংসিত আলোচনা চলেছে যার শেষ পর্যায় যেতে হলে রামকালীবাবুর সাহায্য অন্তত শিবকালীবাবু ও রুনুর কাছে অত্যাবশ্যক।

দাদা, ব্রজ বলছে রুনুর আর পড়াশুনার দরকার নেই।

কথাটা প্রায় শেষ হওয়ার আগেই ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, কলেজে পড়াটা আমার ইচ্ছে নয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরা কলেজে পড়তে যাবে, লোকে বলবে কি ?

না জ্যাঠামশায়। আমি ভর্তি যখন হয়েছি তখন পড়বো, রামকালীবাবুর কাছ ঘেঁষে আবদারের সুরে বললে রুনু।

তাই তো সমস্যা বটে। হাসতে হাসতে বললেন রামকালীবাবু।

দেখো দাদা কলেজে পড়িয়ে মেয়েদের ধিঙ্গি করা আমি পছন্দ করি না। ওই বেম্য মেয়েদের কাণ্ডতো দেখেছো ? বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে।

বাবার যত কথা। শুধু বেম্ন মেয়েরাই বুঝি পড়ে কলেজে ?

ব্রজেন্দ্রনাথ খিঁচিয়ে উঠলেন, তুই তো সব জানিস। হয় বেম্য, নয় বাঙ্গাল, কলকাতার বনেদী বংশের একটা মেয়ে দেখা দেখি কলেজে পড়ছে।

রুনু কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, তাকে থামিয়ে দিয়ে খাদপঞ্চমে বললেন রামকালীবাবু, পড়ে ব্রজ পড়ে। আর নাই যদি পড়ে, তাতেই বা কি ? নিজেদের কথা, নজির না দেখে নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে।

নিশ্চয়। তুমি ?

খুব। যেন একটা পথ খুঁজে পাচ্ছি। হয়তো—কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল রুনু।

অমিতাভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

থাক সে কথা। অমিদা কোথায় ?

ওই নতুন ভাড়াটের ছেলেরা ধরে নিয়ে গেল।

তুমি গেলে না ?

না।

অমিদাকে ওদের সঙ্গে মিশতে বারণ করো না কেন ?

কেন বলো তো, একটু অবাক হয়ে বললে অমিতাভ।

ওদের আমার বেশ ভালো লাগে না, তা ছাড়া দুটো চালিয়াৎ মেয়ে আছে বড় পুরুষ ঘেঁষা।

হো হো করে হেসে উঠলো অমিতাভ; ক্ষুণ্ণ রুনুর মুখখানা টলটল করে উঠলো। অমিতাভ তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, অমনি রাগ হয়ে গেল। অমি কি আমার ছাত্র যে বারণ করলেই সে শুনবে ?

যাও আমাকে ভোলাতে হবে না। কাঁধের থেকে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলে রুনু।

স্মৃতির ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অমিতাভর মন: বয়স হলেই কিছু আর মনটা পালটায় না। দুর্বল মুহূর্তে কখন যেন কাবু করে দেয় হিসেবী পাকা সতর্কতা। তার অভিমানরাঙ্গা মুখের দিকে চেয়ে বললে অমিতাভ রাগের ভান করে, বেশ আর ভোলাবো না।

তার কথা বলার ধরন দেখে হেসে ফেললে রুনু, বললে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে, রাগটা শুধু আমারই হয়, না ?

নয় তো কি ?

আচ্ছা সে বিচার তোলা রইল, আমি এখন চললুম। তাকে লক্ষ্য করে আঙুল নাড়িয়ে কথাকটা বলে রুনু চলে গেল।

সপ্তম সর্গ

স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে বেরিয়ে অমিতাভ নিশিকান্তবাবুর অংশটার সামনে দাঁড়ালো ; ছেলেদের বসবার ঘরে তখন প্রচণ্ড আড্ডা জমে উঠেছে। এ সময় যাওয়া উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়লো অমিতাভ ঘরটার মধ্যে। সুকিৎ ঘোষের সেই ভাঙ্গা ঘরটার চেহারা পালটে গেছে। সৌখীনভাবে সাজানো ঘরে ততোধিক সৌখীন পোশাক পরা ছেলেরা বসে। তাকে দেখে নিশিকান্তবাবুর বড়ছেলে সুখেন্দু এগিয়ে এসে বললে, এসো এসো অমিতাভ—আজ পথ ভুলে নাকি ?

মৃদু হেসে চাইল অমিতাভ সবার দিকে। তাকে মাঝখানের একটা সোফায় বসিয়ে সুখেন্দু বললে, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি —ইনি বিমল বোস, সাহিত্যিক কবি কলেজের জুয়েল ; এর নাম মৃগাঙ্ক পালিত, দক্ষিণ পাড়ার দারুণ সরেস বনেদী, বর্তমানে জার্ণালিজম্ করছেন ; এই অমল সোম, কলেজের ভাল ডিবেটার, আইন অমান্য আন্দোলনে জেল খেটে এসে এখন মার্কসিজম চর্চা করছেন আর ওদের তো তুমি চেনো, আমার ভাই নবেন্দু অমলেন্দু। ফিরে বললে—ইনি অমিতাভ রায়, আমাদের এই বাড়ির বাসিন্দা, কংগ্রেসভক্ত দেশসেবক।

নমস্কারের পালা শেষ করে অমিতাভ চাইল হাসিমুখে।

অমল সোম তার দিকে চেয়ে বললে, মিষ্টার রায়, আবার তো ঘনিয়ে এসেছে, দু-একদিনের মধ্যে আন্দোলন শুরু হবে, কি করবেন ঠিক করলেন ?

প্রসঙ্গটা উঠেছে দেখে খুশি হয়ে বললে অমিতাভ, যোগ দেবো আন্দোলনে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও যোগ দিতে বলবো।

আমিও যোগ দেবো ঠিক করেছি কিন্তু এঁরা বাধা দিচ্ছেন।

কেন ? হেসে বললে অমিভাভ।

অমল সোমকে থামিয়ে দিয়ে সুখেন্দু উত্তর দিলে, কারণ এ

আন্দোলন বুর্জোয়াচালিত, এতে স্বাধীনতা আসবে না, যদি আসে ত সে লাল শাসকের তাঁবেদার কালো শাসক।

অমিতাভ সোজা হয়ে উঠে বসলো, ঠোঁটের কোণে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো।

তাড়াতাড়ি বললে অমল সোম, আমি কিন্তু এদের সব কথা মানি না অমিতবাবু।

সুখেন্দুবাবু লাল শাসকবৃন্দকে কাল শাসকবৃন্দের চেয়ে বেশী পছন্দ করেন দেখছি। কথার মধ্যে ঝাঁজের একটু আমেজ কিছুতেই এড়াতে পারলো না অমিতাভ।

সুখেন্দু যেন এই অপেক্ষাই করছিল, বিশেষ ভঙ্গীতে চিবিয়ে চিবিয়ে কায়দামাফিক বললে সে, আমরা এমন একটা আন্দোলনের অপেক্ষায় আছি যা ইণ্ডিয়ার ম্যাপের ওপর থেকে ওই দু-রকম শাসকেরই চিহ্ন লোপ করবে। যাকে বলে প্রলিটারিয়েট রেভলিউশন।

ভোজবাজীতে বিশ্বাস আছে দেখছি আপনার। মৃদু হেসে উত্তর দিলে অমিতাভ।

ঠাট্টা করছেন? কিন্তু জানবেন একমাত্র প্রলিটারিয়েট রেভলিউশনই স্বাধীনতা দিতে পারে দেশের জনগণকে।

এইসব দিবাস্বপ্ন নিষ্ক্রিয়তার বর্ম বটে।

তুমি বুঝবে না অমিতাভ। অনুযোগের সুরে বললে সুখেন্দু।

আঃ থামাবে তোমাদের পলিটিকেল জাগলারি! কোণের সোফায় চোখ বুজে বসে থাকা বিমল বোস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

অমল বোস সুখেন্দুকে ইশারা করে বিমলকে বললে, কবি তুমি নাকি আজকাল চরকার ওপর কবিতা লিখছো?

রটে, কে বললে?

কেন, তোমার দাদা, সেই চরকা সঙ্ঘের।

ও ইয়েস মনে পড়েছে। বলেছিল বটে একটা লিখতে।

॥ ২ ॥

ছবির দোকান থেকে বেরিয়ে. প্রায় নৃত্যের তালে এগিয়ে চললো ললিত। এ মাসের রোজগার তার আশাতীত। নোটের বাণ্ডিলে পকেটটা বোঝাই ; দেশী প্রিন্সদের মতন দিলদরিয়া মেজাজ।

বাদশাহী সড়ক কাটিয়ে সে ঢুকে পড়লো আধুনিক পিচের রাস্তায়। রেস্তোরাঁর খোঁজে চারিদিক চাইতে চাইতে চললো। হঠাৎ পেছন থেকে টাঙ্গাওয়ালার গলা শুনতে পেলে, ক্যা বাবু বেহুস্ হায় ?

পিঠের কাছে ঘোড়ার নিঃশ্বাসে চমকে উঠে সে পাশের দিকে সরে গেল। যেতে যেতে দেখলে খানিকটা দূরে একটা মিছিল, জাতীয় পতাকা নিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে ; কোথা থেকে একদল পুলিশ এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে এলো সামনেটা। ভয় পেয়ে ললিত পাশের একটা গলিতে সরে গেল। গোলমাল মিটে যেতেই আবার চললো বড় রাস্তা দিয়ে। তার মনে পড়লো একটা মুখ, মিনটু! আবার গোলমাল বেধেছে, হয়তো সেও মেতে গেছে এতদিনে। ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা ; দিদি, বাবা, রামকালীবাবু, অমিয়—মিত্তিরবাড়ির সবাইকে মনে পড়ে গেল। যেতে যেতে চোখে পড়লো, দি গ্রাণ্ড রেস্তোরাঁ। ধীরপদে কারপেট পাতা প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

একটা কেবিনের মধ্যে বসতেই ওয়েটার নামিয়ে দিলে টেবিলে ফ্রেমে আঁটা মেন্যুটা।

নাম না জানা দুটো খাবার মেন্যু থেকে খুঁজে বার করে অর্ডার দিলে। ওয়েটার দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করলে, ড্রিঙ্ক বাবুজী ?

তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল

যেন পালিয়ে গেল দরজার মধ্যে। টাঙ্গাওয়ালা তার দানার থলেটা ঘোড়ার মুখের সামনে ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে।

নিজের ঘরের মধ্যে এসে ললিতের কানে গেল বারান্দায় ম্যানেজারের সঙ্গে একজন অপরিচিত লোক কথা বলছে। তার নিজের নাম তাদের মুখে শুনে কান খাড়া করে তাদের অবোধ্য উর্দু বোঝার চেষ্টা করলে। খানিকটা বুঝেই তার শরীর হিম হয়ে এলো। ম্যানেজার বোঝাতে চেষ্টা করছে, সে চিত্রকর, আর অপরিচিত কণ্ঠস্বর প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে, সে চিত্রকর নয় ফেরারী; বাঙ্গালী স্বদেশী আসামী, চিত্রকর সেজে নাম ভাঁড়িয়ে এখানে আছে; এর ভুল হতে পারে না কারণ তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এর আগে, কত বড় বড় স্বদেশীকে সে গ্রেপ্তার করেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে ললিত তার সুটকেশটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘোড়াকে দানা খাওয়াবার জন্যে টাঙ্গাটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। তাতে চেপে সে বললে, চলো স্টেশন।

স্টেশনে একটা চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠে, ললিত চাইল আগ্রার দিকে। যেতে যেতে তাজের দিকে চাইল বিদায়ী দৃষ্টিতে; এখান থেকে নিজেকে যেন টেনে ছিঁড়তে হচ্ছে।

তুমি যে আজ কাজে যাওনি ?

ছুটি নিয়েছি শরীরটা ভাল নেই ।

মালতীদির খবর কি ?

ভালই আছে, দোকান করছে বস্তিতে।

সেখানে কোন বিপদ হবে না তো ?

না আমাদের লোক আছে, লক্ষ্য রাখে ।

যাক্ একটা কথা তোমার কাছে জানতে এলুম। নড়ে বসে গম্ভীরভাবে বললে অমিতাভ ।

বলো ।

মালতীদিকে তুমি বিয়ে করতে পারো কি না ।

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্যে সুরেনের মুখের একটু পরিবর্তন হলো। সে মাথা নেড়ে বললে, ও প্রশ্ন অবান্তর ! তা ছাড়া তোমার মালতীদি আমাকে দেখলেই জ্বলে ওঠেন। এ হেন স্ত্রীভাগ্য মোটেই সুবিধে নয় ।

চেষ্টা করতে আপত্তি কি ? হেসে বললে অমিতাভ ।

কঠিনভাবে উত্তর দিলে সুরেন, অসম্ভব ।

আর একটা কথা, আমাদের আন্দোলনে তোমরা যোগ দেবে সুরেনদা ?

বড় শক্ত প্রশ্ন !

ভারতের স্বাধীনতা কি শ্রমিকদের কাম্য নয় ?

নিশ্চয় !

তবে এখনও দ্বিধা কেন ?

দ্বিধা কই অমিতাভ ? আমরা আমাদেব সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সেই দিকেই তো এগোচ্ছি !

কিন্তু এখনই যে তোমাদের সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে !

আমাদের কেউ কেউ যোগ দেবে তোমাদের সঙ্গে !

তুমি ? তোমার শ্রমিক সঙ্ঘ ?

আমার পথ শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে বাঁধা ভাই। তোমরা খবর রাখো না, পুলিশের নজর আমাদের ওপরও কিছু কম নেই ; আমাদের শ্রেণী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবার জন্যে, সরকার গত কবছরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে, নেতাদের রাজবন্দী করেছে,—ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে জেল দিয়েছে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন বাঁচিয়ে রাখাই এখন মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তুমি জেনে রাখো, আমরা প্রস্তুত হলেই তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

কথাগুলো বলে ক্লান্তভাবে সুরেন চাইল তাদের দিকে। অমি-তাভ বললে দমে গিয়ে, তোমাদের সম্বন্ধে আমি ভাল জানি না, তবে আমার অনুরোধ, তোমরা এগিয়ে এসো এই আন্দোলনে, তোমাদেরও মঙ্গল হবে।

প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করছি আমরা শ্রমিক সংগঠনের মধ্যেদিয়ে।

অমিয়কান্তি বিরক্তভাবে বললে, চল্ মিনটু এখানে কতক্ষণ কাটাবি, আমাদের যে যেতে হবে অনেক দূর।

এই যে যাই, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আসি সুরেনদা।

এসো ভাই।

ওরা বেরিয়ে গেল ; বিমনায়মান দৃষ্টিতে সুরেন চেয়ে রইল পথের দিকে।

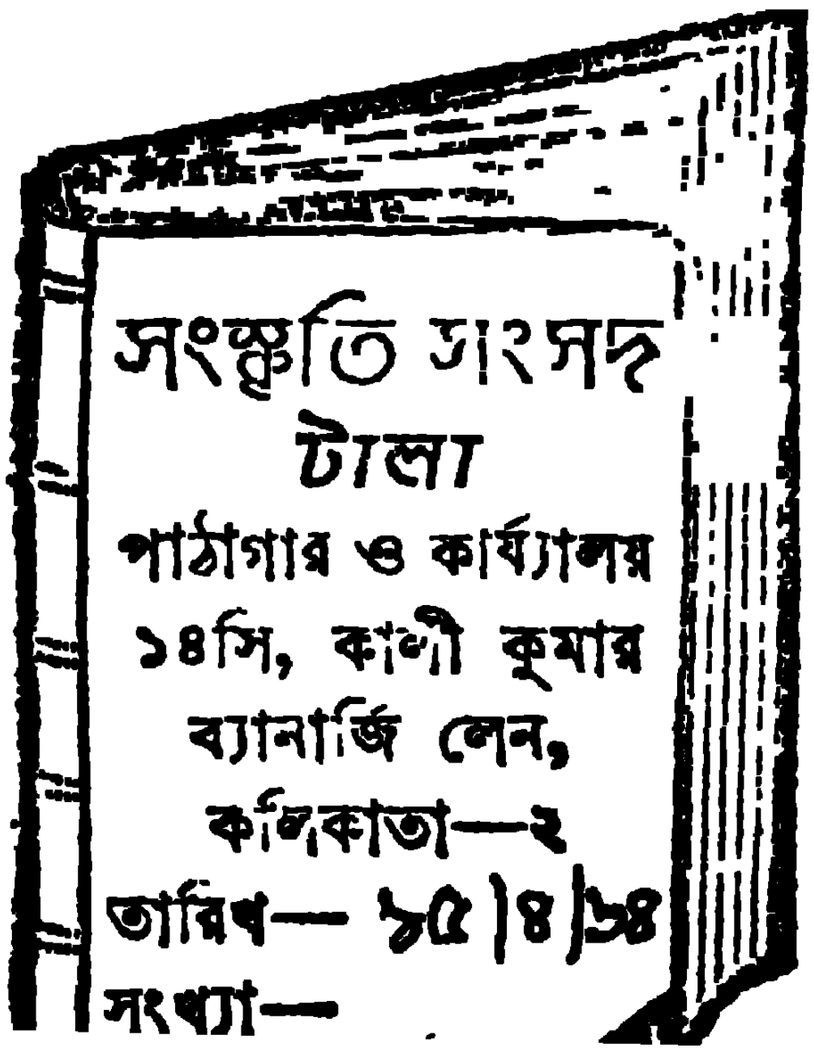

তার মুখের ওপর হাত চেপে ধরে পুলিশের চলল ধস্তাধস্তি, গোটা-কতক পুলিশ তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে গেল রাস্তায় দাঁড়করানো প্রিজন ভ্যানটার কাছে ; একটা আছাড় দিয়ে ফেলে দিলে ভেতরে ; ভর্তি ভ্যানটা ছুটে চললো। আওয়াজ উঠলো, 'বন্দেমাতরম্'।

লালবাজারের লালবাড়িটার সামনে সবাইকে সার বেঁধে নামিয়ে নিলে ; তারা চললো দুপাশে রাইফেলধারী পাহারাদারদের মাঝ দিয়ে। অমিতাভর চোখে পড়লো দেওয়ালের গোল ঘড়িটায় ন'টা বেজে দু মিনিট ; ছাদের পশ্চিম কোণে আলসে ভর দিয়ে রুনু হয়তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়, জানিয়ে এলেই হতো।

ছাত্রদের এ হুজুগ আমরা সমর্থন করি না। বললে সুখেন্দু।

মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো অমিয়কান্তির, জ্বলন্ত চোখে তার দিকে চেয়ে বললে, মেয়েদের বুকের ওপর দিয়ে কলেজে গেলেই পারতেন ?

ওটা সভ্যতায় বাধে, তাই ফিরতে হলো। বললে বিমল বোস।

ধন্যবাদ! হন্‌হন্ করে চলে গেল অমিয়কান্তি সেখান থেকে।

দলে দলে ছাত্র এসে জমা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। উত্তেজিত ছাত্রসমাজ যেন আজ পথের হদিস পেয়েছে; বহুদিনের স্বপ্নোজ্জ্বল স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় রূপ, তারা যেন দেখতে পাচ্ছে শত লাঞ্ছনার মধ্যে।

শুরু হলো সভার কাজ। সহস্র ছাত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো প্রতিজ্ঞার বাণী। বন্দেমাতরম্, স্বাধীন ভারত কি জয় ধ্বনিতে গমগম করে উঠলো বিদ্যামন্দির।

চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সার্জেণ্ট পুলিশের দল সেপাই-সৈন্য সুসজ্জিতভাবে। নিজেদের প্রিয় শিক্ষায়তনের দিকে চেয়ে বইশুদ্ধ হাত তুলে আওয়াজ তুললো ছাত্রদল, বন্দেমাতরম্।

লাঠিচার্জ শুরু হলো অহিংস সৈনিকদের ওপর। যারা দুর্বল তারা আশ্রয়ের জন্যে ছুটে চললো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে; অহিংস শিক্ষায় যারা আত্মবিশ্বাসী তারা মাথা পেতে দাঁড়ালো লাঠির সামনে।

কালো কালো দৈত্যের মত প্রিজনভ্যান্‌গুলো আহত ছাত্রে বিদ্রোহী ছাত্রে বোঝাই হয়ে ছুটে চললো অনির্দিষ্টভাবে, কোথায় কে জানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সিঁড়িগুলো ক্ষিপ্ত সার্জেণ্টদের সবুট পদভারে আর্তনাদ করে উঠলো। পবিত্র শিক্ষায়তনের ওপর এই অত্যাচারে বেঙ্গল টাইগারের মর্মর মূর্তির চোখে বুঝি অশ্রু ফুটে উঠলো।

তিনজনে এগোল ট্রামরাস্তার দিকে। নবেন্দু বললে, কিসে যাবেন ? ট্রামে না বাসে।

ট্রামে চাপা উচিত নয়, বাসেই চলুন, বললে বিনতা।

একটা যাত্রীভর্তি কালীঘাটের বাসে তিনজনে উঠে পড়লো।

বাসের মধ্যে দু একজন লোকের সঙ্গে মুখচাওয়াচায়ি হয়ে গেল অমিয়কান্তির। নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, ওরা কে ?

তার কানে কানে অমিয়কান্তি বললে, ওরাও যাচ্ছে, আমাদেরই লোক।

ধর্মতলার মোড়ে তিনজনে নেমে পড়লো ; অমিয়কান্তি বললে, চলো আগে একটু চা খেয়ে নি, এখনও সময় হয়নি।

সামনেই একটা বোম্বাই চায়ের দোকানে তিনজনে গিয়ে বসলো, মুখগুলো ট্রামডিপোর দিকে ঘুরিয়ে।

সবাইয়ের বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে ; ওইখানে, কলকাতার বুকের ওপর, ট্রামযাত্রীদের আশ্রয়স্থলে অল্পক্ষণ পরেই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাবে, অথচ, এখনও ওই পাশে বসা পানের দোকারদারটাও সেকথা জানে না। ওই যে পুলিশটা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর আড়চোখে গোঁফে তা দিয়ে নিজেকে জাহির করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ওই ফিকফিকে হাসিভরা মুখটা এখুনি বন্য হিংসালু হয়ে উঠবে।

কিছু খেয়ে নিন, খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিয়ে বললে বিনতা।

অমিয়কান্তি একটা কেক্ তুলে খেতে খেতে চাইল তার দিকে।

চেয়ে আছেন যে ? প্রশ্ন করলে বিনতা।

ভাবছি আপনাকে এইখানেই বসিয়ে রেখে আমরা যাবো।

তা বইকি। আমার তো হাত পা নেই। রেগে বললে বিনতা।

নবেন্দু তুমি কি বলো ?

আমার কথা থাকলে তো। যেন ঠেস দিয়ে বললে নবেন্দু বিনতার দিকে চেয়ে।

তোমরা যদি আমার সঙ্গে লাগো তা হলে তোমাদের চা শেষ হওয়ার আগেই আমি ওখানে গিয়ে দাঁড়াবো।

চেনা চেনা মুখের আবির্ভাব দেখে অমিয়কান্তি উঠে দাঁড়ালো; উদ্বেগে আচ্ছন্ন মুখগুলো প্রতীক্ষায় চঞ্চল। সে বললে, চলো এইবার সময় হয়েছে।

গাড়ী মোটর বাঁচিয়ে তিনজনে চৌরঙ্গী পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ট্রামযাত্রীদের আশ্রয়স্থলে। সেটা ভোজবাজীর মত মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল স্বরাজপথের যাত্রীদলে। সরকারের সযত্নে রক্ষিত ফেউদের চোখে ধূলি দিয়ে শুরু হলো ঐতিহাসিক অধিবেশন।

ভারতীয় সূর্যকিরণের স্নেহস্পর্শে তাম্রবর্ণা সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার শান্ত মুখখানি জনতার মস্তক ছাপিয়ে ওপরে উঠে এলো। লিখিত সাতদফা প্রস্তাব পাশ করা হলো অধিবেশনে। সচকিত পুলিশদের আইনরক্ষার কাজও শুরু হলো পুরো দমে।

গ্রেপ্তার শুরু হলো অটল অচল প্রতিনিধিদের। সামান্য সময়ের মধ্যেই অধিবেশনেব কাজ শেষ করে সভানেত্রী সরকারের অপ্রিয় অতিথি হলেন।

বন্দেমাতরম্, স্বাধীন ভারত কি জয়, গান্ধীজি কি জয় ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো ইংরাজদের পরিপাটি পল্লী প্রান্তর।

অমিয়কান্তি নবেন্দু বিনতা প্রিজনভ্যানের মধ্যে বসে জয়োল্লাস করে উঠলো, বন্দেমাতরম্। চৌরঙ্গীর সৌখান পথিকদের কানে ভেসে এলো চলন্ত প্রিজনভ্যানের ভেতর থেকে সমবেত গানের কলি :

এই শিকল পরা ছল আমাদের
শিকল পরা ছল—